উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

কোর পত্র – ১০২ (আবশ্যিক)

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ চর্যাপদের সাধারণ আলোচনা

একক ২ চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ ১, ৫, ৬, ৮, ১৪

একক ৩ চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ ২১, ২২, ২৮, ২৯, ৪২

একক ৪ চর্যাপদের কবি পরিচয়

একক ৫ বৈষ্ণব পদাবলীর সাধারণ আলোচনা

একক ৬ পদাবলীর পর্যায় বিভাগ- গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী, গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত

একক ৭ পদাবলীর পর্যায় বিভাগ- মাথুর, আত্মনিবেদন, ভাবসম্মিলন, প্রার্থনা

পর্যায় খ

একক ৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাধারন আলোচনা

একক ৯ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খণ্ড

একক ১০ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ

একক ১১ চৈতন্য চরিতামৃতের সাধারন আলোচনা

একক ১২ চৈতন্য চরিতামৃতের কাব্য পরিকল্পনা

একক ১৩ আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একক ১৪ মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছে

কোর পত্র – ১০২ (আবশ্যিক) - প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

একক ১। চর্যাপদ - রচনার উদ্দেশ্য, ভুমিকাঃ আবিষ্কার ও গুরুত্ব, পুঁথি পরিচয় ও প্রকৃত নাম, সাধনতত্ত্ব, চর্যাপদের ধর্মীয় তাত্ত্বিক দর্শন, সামাজিক জীবনযাত্রা, ভাষা, চর্যার ভাষার পদ গঠনের রীতি, ভাষার সাঙ্কেতিকতা, কাব্যমুল্য, চর্যার গীতিধর্ম।

একক ২। চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ - পদ সংখ্যা ১, ৫, ৬, ৮, ১৪ – মূলপদ, ভাষাতাত্ত্বিক টীকা, মর্মার্থ ব্যাখ্যা, আধুনিক বাংলা রূপান্তর।

একক ৩। চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ - পদ সংখ্যা ২১, ২২, ২৮, ২৯, ৪২ – মূলপদ, ভাষাতাত্ত্বিক টীকা, মর্মার্থ ব্যাখ্যা, আধুনিক বাংলা রূপান্তর।

একক ৪। চর্যাপদের কবি – লুইপাদ, কুক্কুরীপা, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহ পাদ, শবরপাদ, শান্তি পাদ।

একক ৫। বৈষ্ণব পদাবলী – উদ্দেশ্য, পদাবলীর বিষয়, বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চরস।

একক ৬। পদাবলীর পর্যায় বিভাগ - গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী, গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ - অনুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ – প্রেমবৈচিত্ত্য।

একক ৭। পদাবলীর পর্যায় বিভাগ - মাথুর, আত্মনিবেদন, ভাবসম্মিলন,প্রার্থনা

একক ১। চর্যাপদ

বিন্যাস ক্রম

১.১) রচনার উদ্দেশ্য

১.২) ভুমিকাঃ আবিষ্কার ও গুরুত্ব

১.৩) পুঁথি পরিচয় ও প্রকৃত নাম

ক) পুঁথি পরিচয়

খ) পুঁথির নামবিচার

১.৪) সাধনতত্ত্ব

১.৫) চর্যাপদের ধর্মীয় তাত্ত্বিক দর্শন

১.৬) সামাজিক জীবনযাত্রা

১.৭) ভাষা

১.৮) চর্যার ভাষার পদ গঠনের রীতি

১.৯) ভাষার সাঙ্কেতিকতা

১.১০) কাব্যমুল্য

১.১১) চর্যার গীতিধর্ম

১.১২) অনুশীলনী

১.১৩) গ্রন্থপঞ্জী

১.১) রচনার উদ্দেশ্য

যে কোন দেশের যে কোন কালের যে কোন ভাষার সাহিত্য বিচারে সেই দেশের ভূগোল ও ইতিহাসের সঙ্গে দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস জানা প্রয়োজন।দেশের আধারকে আশ্রয় করে এবং জীবনরূপ অবলম্বন করে সাহিত্য রূপ প্রকাশিত হয়। যুগ বিভাগের দিক থেকে প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাগীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে -

প্রথমতঃ চর্যাগীতির পদগুলি বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হলেও এগুলো রচিত হয়েছিল তার হাজার বছর আগে বাংলা ভাষা সৃষ্টির লগ্নে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।

দ্বিতীয়তঃ চর্যাগীতির রচনাকালে, পূর্বভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতের ধর্মীয় বাতাবরণ সম্পর্কে ধারনা দেয় চর্যাগীতিগুলি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন হল চর্যাপদ।এই পদাবলীর পুরাতন পুঁথি নেপালের রাজদরবার থেকে অনান্য পুঁথির সঙ্গে ১৯০৭ সালে সংগ্রহ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।তাকেই 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নাম দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ সালে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।এই চর্যা পদাবলীর মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণের সাধনতত্ত্বের রূপকে গভীর জীবনবোধ ও বোধিচিত্তের উল্লেখ আছে।সাধন মার্গের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যার সারমর্মে পৌঁছে বোধি জ্ঞানের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি।

১.২ ভুমিকাঃ আবিষ্কার ও গুরুত্ব

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের গুরুত্ব অপরিসীম।এর আগে বাংলা ভাষায় কিছু লেখা হয়নি। সম্পূর্ণ নতুন ভাষায় সমকালীন সমাজচিত্র,মানবজীবনের তত্ত্বকে সিদ্ধাচার্যগণ সাধনগীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

আবিষ্কার ও গুরুত্ব

'চর্যাগীতি' বা চর্যাপদাবলীর আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।এর একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়, দুরূহ দর্শন ও জীবনচর্যার রূপ সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।তিনি নেপাল গিয়ে এই ধরনের বহু সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার করেন।এদের মধ্যে কিছু নির্বাচিত পুঁথির কথাবস্তুর বিবরণ দিয়ে তিনি ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ওপর ভারত সরকার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের ভার দেন। রাজেন্দ্রলালের পুস্তক ও অন্যান্য পুঁথি পত্রের ভিত্তিতে হরপ্রসাদ অনুমান করেন যে,নেপালের নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত নানা পুঁথি সংরক্ষিত আছে এবং তাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর ধর্মজীবনের দুর্লভ উপকরণ সঞ্চিত রয়েছে।এইসব উপকরণ সংগ্রহের জন্যে তিনি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নিজে প্রথম, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ অধ্যাপক বেন্দেলের সঙ্গে দ্বিতীয় বার ও ১৯০৭ সালে নিজে তৃতীয় বার নেপাল যাত্রা করেন।এই যাত্রায় তিনি নেপাল থেকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'(চর্যাগীতিকোষ),সরহ পাদের অবহটঠে রচিত দোহা, অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে রচিত 'সহজন্নায় পঞ্জিকা' নামে টীকা, কৃষ্ণাচার্জের দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে রচিত 'মেখলা' নামে একটি টীকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার নেপাল যাত্রায় তিনি ' ডাকার্নব' নামে একটি পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়',সরহের দোহা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও ডাকার্নব - এই চারটি

গ্রন্থকে একত্রে নিয়ে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় ভুমিকা সহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

গ্রন্থটির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন "১৯০৭ সালে আবার নেপাল গিয়া আমি কয়েকখানি পুঁথি দেখিতে পাইলাম।একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়',উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে।গানগুলি বৈষ্ণব কীর্তনের মত,গানের নাম চর্যাপদ।আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নামও দোহাকোষ,গ্রন্থাকারের নাম কৃষ্ণাচার্য ,উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।"(হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'। পৃষ্ঠা ৪-৫, ১৩৮৮ ব।সং)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বুঝেছিলেন, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় এবং অপর তিনটি পুঁথির ভাষা প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন।কিন্তু ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'The Origin and Development of the Bengali Literature' গ্রন্থে নিঃসংশয়ভাবে প্রমান করেন যে, শাস্ত্রী সংগৃহীত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ।বাকি তিনটি গ্রন্থের ভাষা শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংস(অবহটঠ)।

এই গ্রন্থ আবিস্কারের ফলে,

প্রথমতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেল।এর আগে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে রামাই পণ্ডিতের 'শুন্যপুরাণ', ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন রচনাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলেছিলেন। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ভ্রান্ত ধারনা খণ্ডিত ও পরিত্যক্ত হল।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী কীর্তন পদাবলী, সহজিয়া পদাবলী ও বাউল গানের সঙ্গে বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের এই আদিমতম নিদর্শনের যোগসূত্রটিও খুঁজে পাওয়া গেল।

তৃতীয়তঃ বাংলা ভাষার আদি স্তরের রূপতাত্ত্বিক (Morphological) ও ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological) প্রকৃতি চিহ্নিত ও সুস্পষ্ট হল।

সুতরাং চর্যাপদের আবিষ্কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিমেয় গুরুত্ব বহন করছে।এটি আবিষ্কৃত না হলে বাঙালীর জীবনপরিচয় ও আধ্যাত্মসাধনার রূপ আমাদের কাছে উদঘাটিত হত না।

১.৩ পুঁথি পরিচয় ও প্রকৃত নাম

ক) পুঁথি পরিচয়

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থের পুঁথিটি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারের(বর্তমান 'রাষ্ট্রীয় অভিলেখালয়') সংরক্ষিত। পুঁথিটি তালপাতার।এর প্রথম পত্রের সম্মুখ পৃষ্ঠায় পুঁথির পরিচয় হিসেবে দেবনাগরী অক্ষরে ' চর্য্যাচর্য্যটীকা ' নামটি লেখা আছে। মূল পুঁথি প্রাচীন নেপালি বা নেওয়ারি হরফে লেখা,মাঝে মাঝে প্রাচীন বাংলা হরফও আছে।পুথিতে ১ থেকে ৬৯ পৃষ্ঠাঙ্ক আছে। সম্ভবত ৬৯ এর পর আরও একটা পৃষ্ঠা ছিল, যাতে টীকাকার মুনিদত্তের নাম ছিল।এই পৃষ্ঠাটি নেই। পুঁথির মধ্যে ৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,এবং ৬৬ সংখ্যক পত্রগুলি নেই। পুঁথিটি ৫০ টি মূল বাংলা গান ও তার সংস্কৃত টীকার সঙ্কলন। টীকাটির নাম -'নির্মলগিরা'। পুঁথির কতগুলি পাতা না থাকায় ২৪,২৫ ও ৪৮ এই তিনটি পূর্ণ পদ,২৩ সংখ্যক পদের অর্ধাংশ এবং তাদের টীকা পাওয়া যায়না। টীকাকার মুনিদুত্ত সম্ভবত তাঁর আদর্শ পুঁথি থেকে ৫১ টি পদ সংকলন করেছিলেন। কিন্তু পুঁথি লেখক ১০ সংখ্যক পদের পর "লাড়ীডোম্বীপাদানাম সুনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি" বলে ১১ সংখ্যক পদটিকে বাদ দিয়ে ১২ সংখ্যক পদটিকে ১১ সংখ্যক পদ ধরেছেন। চর্যা পুঁথিতে এই পদটি বাদ গেছে দেখে চর্যাগীতিকোষের তিব্বতী অনুবাদক শীলচারি ও তিব্বতী টীকাকার কীর্তিচন্দ্রও পদটিকে বাদ দিয়েছেন।সুতরাং এই পদটিও লুপ্ত হয়ে গেছে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদ ও টীকা দেখে চর্যাপদের ২৩,২৪,২৫,৪৮ পদের বিষয়বস্তু সংস্কৃতে অনুবাদ করেছেন।এখানে মোট সাড়ে ৪৬ টি পদ আছে।

চর্যা পুঁথির পাতাগুলি ১২ ৮/১০ ইঞ্চি x ১ ৯/১০ইঞ্চি।প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটি করে পঙক্তি টানা লেখা আছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বর্গাকৃতির অংশ ছাড় আছে। পুঁথির বন্ধন সুত্রের জন্যে ছিদ্র রাখার কারনে এই ছাড় রয়েছে।

'চর্যাগীতিকোষ' পুঁথিটি মূল গান ও সংস্কৃত টীকার একটি যুক্ত সংকলন। মূল গানের আদর্শ পুঁথি ও টীকাকার ব্যাবহৃত আদর্শ পুঁথি পৃথক ছিল। কারণ টীকায় গানের যে পদপাঠ ধরা হয়েছে,তাদের কতগুলির সঙ্গে মূল গানগুলির পাঠের কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

খ) পুঁথির নামবিচার

১৯১৬ সালে চর্যাপদ প্রথম প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে পাওয়া যে কয়েকখানি পুঁথি তিনি পেয়েছিলেন তার একটার নাম ' চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'।গ্রন্থের এই নামটি কিন্তু পুঁথিতে বা মূল চর্যায় নেই। সংস্কৃত টীকার মধ্যেও নেই।পুথির কোন 'পুস্পিকা' পাওয়া যায়নি।তাই প্রকৃত গ্রন্থনাম জানা যায়না।হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যা গানগুলির প্রকৃতি অনুসারে গ্রন্থনাম দিয়েছেন। 'চর্য্যা ' শব্দের অর্থ আচরণীয় এবং 'অচর্য্যা 'শব্দের অর্থ অনাচরণীয়। যে গানগুলো বৌদ্ধ সহজযান সাধকদের আচরণীয় এবং অনাচরণীয় কৃত্য নির্ণয় করে,সেই গ্রন্থই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। চর্যা ও অচর্যা বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বিধি ও নিষেধ বোঝায়। যেমন -

৫ সংখ্যক চর্যায় বিধিমুখে বলা হয়েছে -"জই তুমহে লোঅ হে হইব পারগামি/পুচ্ছতু চটিল অনুত্তরসামী।" অর্থাৎ "যদি তোমরা সকলে পারগামী হতে চাও, তবে শ্রেষ্ঠ গুরু চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো।" ৩২ সংখ্যক চর্যায় আছে কিছু নিষেধ। "নিঅড়ি বোহি,মা জাহুরে লাঙ্ক।" অর্থাৎ নিকটেই বোধি,লঙ্কায় যেওনা। প্রথম চর্যায় লুইপাদ বলেছেন "এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।/সুনু পাখ ভিড়ি লাহুরে পাস।" অর্থাৎ বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের আশা এড়িয়ে চলো। শূন্যতা পক্ষের দিকে ভিড়ে পাশ নাও। এক্ষেত্রে নিষেধ ও বিধি একসঙ্গে রয়েছে। শাস্ত্রীর দেওয়া নাম তাই চর্যার প্রকৃতি নির্ণয়ক,গ্রন্থের প্রকৃত নাম নয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেছেন,হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি 'নির্মলগিরা'টীকার একটি ভ্রান্ত পাঠের ওপর নির্ভর করে দেওয়া। মুনিদুত্ত লুইপাদ রচিত "কাআ তরু বর

পঞ্চ বি ডাল" ১ম চর্যার টীকায় লিখেছেন "শ্রীলুইচরণাদিসিদ্ধরচিতে প্যাশ্চ চর্য্যাচর্য্যয়ে সদত্মাবগমায় নির্মল গিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটং।" অর্থাৎ শ্রী লুইপাদ সিদ্ধরচিত আশ্চর্য চর্যাসমূহের মধ্যেও ভাল রাস্তায় প্রবেশের জন্যে পরিষ্কার ভাষায় 'নির্মলগিরা' নামক টীকা লিখছি।এই কথাগুলিই গ্রন্থনামের ইঙ্গিত দেয়।মনিন্দ্রমোহন বসু বলেছেন 'আশ্চর্য্য ' শব্দটি টীকাকার চর্যার বিশ্লেষণ রূপে ব্যাবহার করেছেন, গ্রন্থের নামের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। মুনিদত্ত লিখেছেন "কাআতরুব্যাজেন শুদ্ধধরমতাপীঠিকা , প্রাকৃত ভাষায়া রচয়িতুমাহ কায়েত্যাদি।" বিধুশেখর চর্যার নাম নির্দেশ করেছেন ' আশ্চর্য চর্যাচয় '। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাই এর নাম নির্ধারণ করেছেন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যা পদাবলীর তিব্বতী অনুবাদ ও তিব্বতী টীকার সন্ধান পান। শীলচারীর তিব্বতী অনুবাদ ও কীর্তিচন্দ্রের টীকাসহ অনুবাদ পুঁথির পুষ্পিকায় চর্যা পুঁথির নাম,তার সংস্কৃত টীকাকারের নাম,তিব্বতী অনুবাদক ও টীকাকারের নাম ইত্যাদি মুল্যবান তথ্য পাওয়া জায়।এখান থেকে জানা যায় 'বুধগণ' একশো চর্যার কোষ সংকলন করেছিলেন। শিষ্যদের জ্ঞানদান করার জন্যে মুনিদত্ত তার থেকে ৫০টি পদ বেছে নিয়ে টীকা লেখেন।এই টীকা গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'।হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যে গ্রন্থটি পেয়েছিলেন সেটি মুনিদুত্তের সংস্কৃত টীকাসহ ৫০ টি চর্যাগানের সঙ্কলন।টীকা নিয়ে পুঁথিটির প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' এবং চর্যা সংকলনের নাম 'চর্যাগীতিকোষ'

১.৪) চর্যাপদাবলীর সাধন তত্ত্ব

বৌদ্ধ বজ্রযান থেকে উৎপন্ন সহজযানের সাধনার কথাই চর্যাপদ বলতে নানা রূপক প্রতীকে প্রকাশিত। বৌদ্ধ সহজযানী দর্শন হল ভাববাদী দর্শন। সহজযান সাধকরা মনে করেন আদিতে এ জগত ছিল অনুৎপন্ন । এর কোন বাস্তব সত্তা নেই। বস্তু বিশ্বে যা কিছু আমরা দেখি তা ভ্রান্ত চিত্তের একটি প্রতিভাসমাত্র। ইন্দ্রিয়বেদ্য জ্ঞানে সবই মিথ্যা। পরমার্থতঃ জগতের সৃষ্টি ও নেই ধ্বংস নেই।

৪১ সংখ্যক চর্চায় ভুসুকুপাদ যেমন বলেছেন -

আইএ অনুঅনা এ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।

রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাচে কিঁ তঁ বোড়ো খাই।।

অর্থাৎ আদিতেএই জগত ছিল অনুৎপন্ন । ভ্রান্তিতে সে প্রতিভাত হচ্ছে। দড়িকে সাপ ভেবে যে চমকায় তাকে কি সত্যি বোড়া সাপে খায় ?..... এই-জগৎ হচ্ছে মরুভূমির মরীচিকা, গন্ধর্বের নগরী, দর্পণের প্রতিবিম্ব, বায়ুর আবর্তে সৃষ্ট জলস্তম্ভের মত, বন্ধ্যা নারীর পুত্রের খেলা, বালুকার তেল, শশকের সিং বা আকাশকুসুমের মতো অলীক। প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনে এই ভ্রান্তি অপনোদন করে সাধককে স্বর্গ শূন্যতা বা নির্বাণের বোধে পৌঁছে সহজানন্দ উপলব্ধি করতে হবে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত এক শাশ্বত উপলব্ধিই হল নির্বাণ। এতে সাধকের অহংভাবের বিলোপ হয় এবং নিত্যত্বের বোধ জন্মায়।

সহজযানি বৌদ্ধ সাধকরা মনে করেন, এই সহজানন্দ বা মহা সুখ লাভের বোধ বা বোধি মানবের সহজাত এবং তা নিজদেহের মধ্যেই আছে। তার জন্য দূরে যাবার প্রয়োজন নেই-

"নিঅড় ভি বোহি,দূর মা জাহী ।"

কায়া সাধনার মধ্য দিয়ে দেহের মধ্যে এই বোধি'র উপলব্ধিই সহজযানি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনা। ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- " The Sahajiya cult,as an offshoot of Tantric Buddhism lays that highest stress on the practical method for realising the Sahaja nature of the self and of all the Dharmas" (obscure religious cults) .

শূন্যতা ও করুণার মিলনে সহজ সুখ উপলব্ধির বিষয়টিকে সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকরা দেহের বিবিধ ক্রিয়া সাধন এর উপর স্থাপন করেছেন।এজন্য তারা দেহের মধ্যে চারটি চক্র বা পদ্ম কল্পনা করেছেন। নাভিতে নির্মাণ চক্র, হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র ও মস্তকে সহজ চক্র বা মহাসুখ চক্র। এই শেষ চক্রটিকে উষ্ণীষকমলও বলা হয়। এই মহাসুখ চক্রই বোধিচিত্তের স্বস্থান ।

দেহের চারটি চক্র ছাড়াও সহজিয়া সাধকগণ বামগা, দক্ষিণগা ও মধ্যগা - তিনটি নাড়ীর কথা বলেছেন। বামগা নাড়ীটি প্রজ্ঞা এবং দক্ষিণগা নাড়ীটি উপায়। এদের ধমন -চমণ, আলি- কালি, রবি-শশী, গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে। মধ্যগা নাড়ীটি বিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবধূতী। একেই ডোমনি, শবরী, চন্ডালী ইত্যাদি রূপক নাম দেওয়া হয়েছে । বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীর স্বাভাবিক গতি নিম্নমুখী। বায়ু সংযম করে উভয়ের নিম্নমুখী গতিধারা রুদ্ধ করতে হবে এবং তাকে মধ্যগা অবধূতীমার্গে পাঠিয়ে ঊর্ধ্বগামী করতে হবে। এর ফলে প্রথমে নাভিতে নির্মাণচক্রে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হবে। এরপরে বোধিচিত্ত ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্র পার হয়ে মস্তকের মহাসুখচক্রে পৌছবে। ফলে বোধিচিত্ত তার 'অবিদ্যাপ্রপঞ্চগ্রস্থ' সাংবৃত্তিক রূপ হারিয়ে পারমার্থিক রূপে উত্তীর্ণ হবে। তখনই হবে সহজানন্দের অনুভূতি। এই অনুভূতির চারটি স্তর। নাভিতে নির্মাণ চক্রে আনন্দ। হৃদয়ে ধর্মচক্রে পরমানন্দ। কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দ । সবশেষে মস্তকে মহাসুখচক্রে বা উষ্ণীষকমলে সহজানন্দ বা আত্মিক আনন্দ। প্রজ্ঞা ও উপায়, শূন্যতা ও করুণার মিলনেই এই অদ্বয় মহাসুখের উপলব্ধি ঘটে।

এই বৌদ্ধ তত্ত্ব দর্শন ও দেহবাদী সাধনাই চর্যাগান গুলিতে কখনো সরাসরি, কখনো রূপক প্রতীকের রূপ ধরেছে। প্রথম চর্যাটিতেই আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীর শ্বাস-প্রশ্বাস কে সংযত করে তাকে মধ্যমার্গে প্রেরণের কথা বলেছেন। তিনি ধ্যানে বা ইশারায় এর রূপ দেখেছেন -

ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।

পঞ্চম চর্যায় চাটিলপাদও নদী ও সাঁকোর রূপকে এই বামগা ও দক্ষিণগা নাড়ীর পথ ছেড়ে মধ্যমার্গ অবধূতিকাকে আশ্রয় করার কথা বলেছেন -

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী
নিঅডডী বোহি দূর মা জাহী।

সপ্তম চর্যায় কাহ্নুপাদ বলেছেন , আলিতে কালিতে বাট বা পথ রুদ্ধ হবার কথা। ১৭ সংখ্যক চর্যায় বীনাপাদ শুনিয়েছেন রবি শশী কে কানের কুন্ডল করার কথা। অষ্টম চর্চায় নৌকার রূপকে করুণা ও শূন্যতার মিলনে বাহ্য রূপজগতের অস্তিত্বকে বিলোপ করার তথ্য কথা জানিয়েছেন কম্বলাম্বরপাদ।

সোনে ভরিলী করুণা নাবী

রূপা থোই নাহিক ঠাবী।

অর্থাৎ শূন্যতার সোনায় করুণার নৌকা পূর্ণ। সেখানে রুপজগতের রুপা রাখার ঠাঁই নেই। বোধিচিত্ত কে বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে অবধূতীমার্গে ঊর্ধ্বগামী করার দেহসাধনার কথা বলেছেন চর্যার কবিরা। এই বোধিচিত্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত বলেই তাকে অদৃশ্য কল্পনা করে নীচকুলোদ্ভবা নারী ডোম্বী, চন্ডালী, শবরী প্রভৃতি বলা হয়েছে। কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে ইনি নৈরামনি এবং মস্তকে মহাসুখচক্রে সাধকের নিজ ঘরণী হিসেবে সহজ সুন্দরী। ১০ সংখ্যক চর্যায় কাহ্নপাদ একে বলেছেন নগর বাইরের বাসিন্দা ডোম্বী -"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুরিআ"। সাধক কাহ্নপাদ অপরিশুদ্ধ ডোম্বী বা সাংবৃতিক বোধিচিত্তকে মোরে, অর্থাৎ সাধনায় পরিবর্তিত করে পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বী বা পারমার্থিক বোধিচিত্ত করে নিয়ে সহজানন্দ উপলব্ধি করতে চান -" মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।"

২৮ সংখ্যক সাহিত্য সুন্দর চর্যায় সাধক শবর পাদ কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে নৈরামনি বা নৈরাত্মা এবং মস্তকে মহাসুখচক্রে সহজসুন্দরীর অবস্থানের কথা বলেছেন। উভয় কিন্তু অপৃথক

উমতো সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারা তোহৌরী।

নিঅ ঘরনী ণামে শোহোজ সুন্দরী।

৪৯ সংখ্যক চর্যায় নৌপথে জলদস্যুর আক্রমণের রূপকে সমস্ত বিকল্প ও জ্ঞানের বিলোপে সর্বশূন্যতায় লীন হয়ে মহাসুখমগ্নতার কথা বলেছেন ভুসুকুপাদ -

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খাঁলে বাহিউ।

অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।। ...

পদকর্তা বলেছেন- "বজ্র নৌবহর পদ্মার খালে বাহিত হল। দয়াহীন ডাঙ্গালিয়া দস্যু দেশ

লুট করলো। দগ্ধ হলো পাঁচ পাটন (বাণিজ্য নগর), অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) । নষ্ট হলো ইন্দ্রের সমান রাজ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ। না জানি চিত্ত আমার কোথায় গিয়ে ঢুকলো। সোনা রুপা আমার কিছুই থাকলো না, অর্থাৎ ভব নির্বানের বিকল্প জ্ঞান রইল না। এখন নিজ পরিবারে আমি মহাসুখে রইলাম । অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় লীন হয়ে মহাসুখ মগ্ন হলাম । চার কোটির ভান্ডার আমার নিঃশেষ করে নিল। অর্থাৎ সৎ, অসৎ, সদসৎ, এবং ন সৎ ন অসৎ (অর্থাৎ সত্য, মিথ্যা, তদুভয় ও অনুভয়) এই চার ধরনের বিচারজ্ঞান পরম অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে নিঃশেষিত হ'ল। এই অবস্থায় বাঁচায় মরায় কোন তফাৎ নেই। কথার জীবন-মরণের বিকল্পবোধ লুপ্ত হয়েছে। এটি হলো গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব-রহিত পরিপূর্ণ সহজানন্দমগ্নতা ।

এভাবে দেখা গেল, সহজ সাধকের কায়া সাধনার নানা তত্ত্ব ও প্রক্রিয়ার কথা চর্যাপদাবলীর সন্ধ্যা বচনে ব্যক্ত হয়েছে। তবে তাতে প্রায় সর্বত্রই রয়েছে সাহিত্যের সুরভি।

১.৫) চর্যাপদের ধর্মীয় তাত্ত্বিক দর্শন

চর্যাগীতির ধর্মমত ও দার্শনিক পটভূমিকা নিয়ে বহু কথা প্রচলিত আছে।হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম থেকেই এর ধর্মীয় তত্ত্বে বৌদ্ধ স্বরূপের কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে সকল আলোচক বৌদ্ধ ধর্মের তাত্ত্বিক দর্শনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শন ও সাধনায় কোন এক বিশেষ ধর্ম সাধনার দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করা কঠিন।কারন এ বিষয়ে পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্মমতের প্রভাব দেখা যায়। এখানে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমেছে এবং বানলায় সেন রাজবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধরা নানা ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। চর্যা গানগুলি রচিত হয়েছিল দশম - দ্বাদশ শতাব্দীর পালযুগে।এটি বাংলাদেশের ধর্ম সাধনার সমন্বয়ের যুগ।

ক) বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের মূল কথা

ইতিহাস কোন ধর্মগুরুর আবির্ভাবকে অলৌকিক মনে করেনা।জাতির জীবন, আদর্শ ও সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আবির্ভাব সার্থক হয়। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সমকালের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে তার অনিবার্য যোগাযোগ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন ও প্রসারণের কথা ভাবলে এর সর্বজনীন দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়।ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হলেও ধীরে ধীরে সিংহল ব্রহ্মদেশ শ্যাম কম্বোজ জাপান তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে ধর্ম।স্পষ্ট হয়ে গেল বুদ্ধ তথাগতের মৈত্রী করুনার আশ্বাস বাণী কোন বিশেষ অঞ্চলের জন্য নয় তার দেশকালের সীমার অতীত।অন্যদিকে হিন্দুরা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বদ্ধ এবং ভারতবর্ষের সীমার বাইরে কোনোকালেই বৌদ্ধ ধর্মের মত সে প্রচারে ব্যস্ত হয়নি। এমনকি নিজের সম্প্রসারণে হিন্দুর আগ্রহ ছিল না। হিন্দু পিতা-মাতা থেকে যার জন্ম নয়, হিন্দু সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি।এইখানেই বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মূলগত পার্থক্য।তবে একথা সত্য হিন্দু ধর্মের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসার। বুদ্ধদেবকে ধরা হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপে। এইভাবেই ভারতীয় ধর্মসাধনার বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটেছে। এটি স্পষ্ট হয় বুদ্ধ ধর্ম কোন অহিন্দু ধর্ম নয়। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ লাভের পর কার ধর্ম-দর্শনের মূলসূত্র গুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদ দূরীকরণের জন্য বিশেষ কয়েকবার ধর্মসংঘ আহবান করা হয়েছিল। বৌদ্ধরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান। প্রাচীন থেরবাদীরা হয়ে যান হীনযান এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিবাদীরা মহাযানী নামে অভিহিত হন। এই বিভাজন বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের একটি ক্রমোন্নতি স্তর নির্দেশ করে। হীনযান ও মহাযান শব্দ দুটির আক্ষরিক অর্থ ছোট শকট ও বড় শকট। দুই সম্প্রদায়ের মূল পার্থক্য হল ধর্মের লক্ষ্য আশ্রয়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু বুদ্ধ ধর্মের মূল দার্শনিক ভূমিটি তখনো বিভাজিত হয়েছিল বলা যাবেনা। তবে সেখানেও আদর্শগত বিভাজন রেখাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশা নেই। আর তারা নির্বাণ লাভের উচ্চাশা পোষণ করতেন এবং তা শুধু নিজের জন্য। এজন্য তারা প্রত্যেক 'বুদ্ধ যান' নামে ও পরিচিত। অন্যভাগে মহাযান সম্প্রদায়ের ভাবনা অনেকটা উদার। এরা শুধুমাত্র নিজের জন্য বুদ্ধত্ব লাভের চেষ্টাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। তারা মনে করতেন জগতের প্রত্যেক জীবনের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধের সম্ভাবনা বর্তমান। আর শূন্যতা ও করুণার অপূর্ণতায় অতিষ্ঠ বোধিচিত্ত লাভের মধ্য দিয়ে যে বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ হয় তার ভেতর দিয়েই প্রত্যেকে ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন। মহাজন সম্প্রদায়ের আরেকটি ছোট ধারা ঐতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বাস করতেন না। তাদের ত্রিকায় পরিকল্পনায় বুদ্ধ তিন প্রকার- ধর্ম কায়,নির্মাণ কায় ও সম্ভোগ কায়।বুদ্ধ যখন পরমার্থিক সত্য অবলম্বন করেন তখন তিনি ধর্মকায় অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের মত। তিনি যখন কোনো বোধিসত্ত্বের কাছে নিগূঢ় ধর্মার্থ ব্যক্ত করেন তখন তিনি সম্ভোগ কায় এবং সাধারন ব্যক্তিদের যখন তিনি সূত্রাদি দান করেন তখন তিনি নির্মাণ কায়ে বিচরণ করেন। এইভাবে দুই 'যান ' সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়।জানা যায় মহাজন' সম্প্রদায় প্রত্যেক জীবের বুদ্ধত্বের জন্য বোধিসত্ত্ব

অবস্থা কামনা করতেন।এই অবস্থাকে স্থায়ী করবার জন্য কিংবা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য করুনা, মৈত্রী প্রভৃতি পরম গুণের অনুশীলনকে উপায় মনে করতেন। পরবর্তীকালে মন্ত্র উপাদানকে বুদ্ধত্ব লাভের উপায় হিসেবে ধরা হয়। কাবিরবন্ধু নয় মন্ত্রযানই পরবর্তীকালে সম্ভবত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল।

ভারতীয় দর্শনে তন্ত্রমতে পরমার্থ সত্যের দুই রূপ। নিবৃত্তি রূপ পুরুষ বা শিব এবং প্রবৃত্তিরূপ প্রকৃতি বা শক্তি। পরমার্থ সত্য অদ্বৈত শিবশক্তির মিলিত অবস্থা। এই মিলন ই বিশ্বসৃষ্টি প্রবাহের কারণ। এইমতে সংসারের প্রবৃত্তি স্বরূপ প্রভাবকে পরিবর্তন করে শিবের সঙ্গে অধ্যায় ভাবে যুক্ত করে মুক্তিকামী করে তোলাই জীবের কাজ। তন্ত্র মতে মানব দেহের সকল সত্যের আধার।বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্বরূপ মানব দেহের মধ্যে সূর্য চন্দ্র পাহাড়-পর্বত নদ-নদী প্রবাহ সবকিছুকেই কল্পনা করা হয়। দেবকে যন্ত্র করে শিব শক্তির মিলন ঘটাতে পারলেই পরম সত্য লাভ সহজ হয়। দেহস্থিত মেরুদণ্ডটি মেরু পর্বত। এর সর্বনিম্ন কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা। একে জাগ্রত করে ঊর্ধ্বমুখী করে স্বাধিষ্ঠান,মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, অজ্ঞা প্রভৃতি চক্রের মধ্যে দিয়ে ক্রমে মেরুপর্বতের উপর অবস্থিত সব থেকে উঁচু উত্তর মেরুতে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত নিভৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়াই তান্ত্রিকতার লক্ষ্য।তন্ত্রে কার্যকরী কায়া সাধনায় দেহের বামদিকের ইড়া, দক্ষিণভাগের পিঙ্গলা কে নারী ও পুরুষ বা শক্তি ও শিব হিসেবে ধরা হয়। এর মধ্যস্থ প্রাণবায়ু 'সুষুম্না' পথে সহস্রার মধ্যে উপনীত হওয়া যায়। কায়া সাধনার এই পদ্ধতি তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত।

বৌদ্ধ মহাযানি সম্প্রদায় যখন তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে আসে তখন থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ধারণার প্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে প্রজ্ঞা ও উপায় ক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, মধ্য নাড়ি সুষুম্না পায় অবধুতিকা আখ্যা। চর্যাগীতি গুলি বিশ্লেষণ করলে কায়া সাধনা, ত্রিনাড়ি ও দেহের নানাবিধ চক্র ও পদ্ম পরিকল্পনা- অদ্বয়শক্তি (শিব শক্তির মিলন) তান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে স্পষ্ট করে দেয়। বুদ্ধ কাঠামো ও পরিধিতে ধর্মীয় তান্ত্রিকতা তত্ত্ব দর্শনের স্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

চর্যাপদ গুলিতে হেঁয়ালি ভাষায় কায়া সাধনা ও ত্রিনাড়ি তত্ত্ব কখনো বা স্পষ্ট কখনো অন্য কোন রূপক এ বর্ণিত হয়েছে। নৌকা চালনা , ইঁদুর, মত্ত হাতি কিংবা বাদ্যযন্ত্রের রূপকে নানাবিধ যোগ সাধন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে চর্যার প্রথম পদে উল্লেখিত হয়েছে- 'ধমন ,চমন বেনি পন্ডি বইঠা' ধমন ও চমন অবশ্যই তন্ত্র মতে ইড়া ও পিঙ্গলা। বৌদ্ধ তন্ত্রমতে 'উপায়' ই - রসনা, সূর্য, রবি, প্রান ,চমন, কালি,যমুনা ,গ্রাহ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছে আর তন্ত্রের ইড়া বৌদ্ধ মহাযানি দের 'প্রজ্ঞা' - যা ললনা,চন্দ্র ,শশী, অমান, ধমন, নাদ,গঙ্গা ,গ্রাহক প্রভৃতি নামে উল্লেখিত।মধ্য নাড়ি কিংবা সুষুম্না বৌদ্ধ তন্ত্র মতে ' অবধূতিকা ' - যা শুন্ডিনী, ডোমবি, চন্ডালি, নৈরামণী, সহজ -সুন্দরী ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। যেমন চর্যাগীতি তে পাই-

এক সে শুন্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চি অন বাকল ও বারুণী বান্ধঅ।।

সহজে থির করি বারুনে সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ়কান্ধ।।

অবধূতিকার সঙ্গিনী চন্দ্র-সূর্য ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখে মুগ্ধ নারী সমাজে প্রবেশ করান।তাতে চিকন (অবিদ্যা জলশুন্য) বাকল দ্বারা বোধিচিত্ত কে বন্ধন করে বারুণী সহজ আনন্দ এ অজরামর দৃঢ়স্কন্ধ লাভ করতে পারে।

৫ সংখ্যক চর্যায় সহজানন্দ লাভের স্পষ্ট কথা রয়েছে। এখানে অবধুতিকা কর্তৃক বাম ও দক্ষিণ নাড়িকে মধ্যপথে পরিচালনা করে চিত্তের সহজানন্দ লাভ করার কথা বলা হয়েছে।

ভব নই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।
ধর্মার্থে চাটিল সাঙ্কম গড়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই।। (৫)

ভবনদী গহন গভীর বেগে প্রবাহিত। নদীর দুই তীর কর্দমাক্ত। মাঝে থই পাওয়া যায় না। ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো গঠন করল। পরগামী তাতে নির্ভর করে পার হয়ে যায়।সেখানে নির্দেশ আছে সাঁকোতে চড়ে বাম-ডান হয়োনা অর্থাৎ দ্বিধান্বিত হয়ে যেও না। বোধি তোমার নিকটে দূরে যাবার প্রয়োজন নেই।আপাতদৃষ্টিতে ভবনদী ভব সংসারে রূপক হলেও তন্ত্রমতে দেহ মধ্যস্থিত নারীগুলির ইঙ্গিত দেওয়া আছে। সাঁকো সংবৃতি ও পারমার্থিক বোধিচিত্ত মিলনকে বুঝিয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "এই দেহের ভিতরের জগত্ ব্রহ্মাণ্ড ,এই দেহ সাধনা।এখানেই পরম সিদ্ধি।এই সিদ্ধান্তটি তান্ত্রিক। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার এই তত্ত্ব টি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ দোহাগুলিতে এই তত্ত্ব টি অতি সুন্দর ভাবে স্থান পাইয়াছে।" দেহ সাধনার পরম গুহ্য তত্ত্বে এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে পরম সত্য দেহের মধ্যেই আছে।তাকে উপলব্ধি করে সাধনার দ্বারা জাগ্রত করতে হয় ।তন্ত্রমতে দেহের ৬টি চক্র । মূলাধার ,সাধিষ্ঠান ,মনিপুর, অনাহত ,বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা ।মূলাধার চক্রে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে তাকে ষটচক্রে প্রবাহিত করে মস্তিষ্ক স্থিত পদ্মে শিবের সঙ্গে মিলিত করতে হবে । বৌদ্ধতন্ত্রের বোধিচিত্ত প্রথমে জাগে নাভিদেশে ,নির্মাণ

চক্রে।তাকে ঊর্ধ্বমুখী করে ধর্মচক্র উন্নীত করতে হয় । বৌদ্ধ তন্ত্রে নির্মাণ , সম্ভোগ, ধর্মচক্র ক্রমানুসারে হৃদয়ে সম্ভোগ এবং কণ্ঠে ধর্মচক্র হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিপরীত হয়েছে।এখানে পরম সত্য শূন্য স্বরূপ। বোধিচিত্ত এর দুটি রূপ - সংবৃতি ও পারমার্থিক। সংবৃতি বোধিচিত্ত চঞ্চল ও নিম্নমুখী।একে ঊর্ধ্বমুখী করাই হলো সাধনা। অবধূতিকার নির্দেশিত পথে প্রজ্ঞা ও উপায় কে মিলিত করে পারমার্থিক বোধিচিত্ত উন্নীত হওয়া সম্ভব।এটাই পরমানন্দের কারণ ও মহা সুখের স্বরূপ।

নাভি দেশে নির্মাণ চক্রে চন্ডালী ,শবরী, ডোম্বি বাস করেন । তিনি অস্পর্শ । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাকে স্পর্শ করা যায় না ।অর্ধরাত্রি ধরে বিকশিত হলো -৩২ যোগিনীর অঙ্গ উল্লসিত হচ্ছে। ২৭ সংখ্যক পদে এটি উল্লিখিত আছে।

৬ সংখ্যক পদে নৈরাত্মা রূপিণী হরিণী হরিণ রূপ-বোধিচিত্তকে বিষয় আসক্তির জন্য জীবনের সাবধানবাণী স্বরূপ অন্য বনে চরে খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। কণ্ঠে অবস্থিত নৈরামনি সম্পর্কে ভাবনা - " সুন নৈরমনি কণ্ঠে লইয়া মহাসুয়ে রাত্রি পোহাই।" অর্থাৎ নৈরাত্মর শুদ্ধ উপলব্ধিতে মহাসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চন্ডালি, শবরী আপাতদৃষ্টিতে দেহধারী সাধনসঙ্গিনী মনে হলেও তা নন ।এরা দেহ মধ্যস্থ শক্তির বিভিন্ন নাম। প্রজ্ঞা ও উপায় কে অবধুতি মার্গে প্রথম মিলিত করার মুহূর্তে জাগ্রত হওয়ার শক্তি ই শবরী বা চন্ডালি নামে পরিচিত । উনি যখন সম্ভোগ চক্রে অবস্থান করেন তখনই বেশিরভাগ চর্যায় নৈরাত্মা দেবীর নাম পাওয়া জায়।এই কারনেই সহজিয়া কবিদের মধ্যে হেঁয়ালিপূর্ণ সান্ধ্য ভাষা প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য ছিল।কেবল মাত্র দীক্ষিত সাধক সঠিক গুরুর প্রসাদে এই তত্ত্ব বুঝতে পারে। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম নির্ভর ধর্ম সাধনায় তাই গুরুর প্রাধান্য থাকে।

১.৬) চর্যাপদে সামাজিক জীবন

সহজিয়া সাধক চযার কবিগন চর্যাগীতি গুলি আধ্যাত্মিক সাধন সংগীত হিসেবে তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিন্যাস কবিদের বিশেষ উদ্দেশ্য হলেও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিস্মিত করে। এজন্য ডঃ সত্যব্রত দে তার চর্যাগীতি পরিচয় গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- " বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ গুলি আধ্যাত্মিক সাধন সংগীত"। কিন্তু বিষয়বস্তুতে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক হওয়া সত্ত্বেও চর্যাগীতি গুলির মধ্যে সে যুগের জীবনযাত্রা ও বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র পাওয়া যায় তার নিদর্শন আধ্যাত্মিক সাহিত্যে তো বটেই সম্ভবত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও খুব কম পাওয়া যায়। সাধারণভাবে একথা বলা হয় সমস্ত কাল এর সমস্ত প্রকার সাহিত্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যদি কোনো বিশেষ যুগের সাহিত্য সৃষ্টি হয় তবে তা থেকে সেই যুগের সমাজ, পরিবেশ ও জনমানসের প্রতিফলিত জীবনচিত্র নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। সমকালের সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার অনুসন্ধান করা যায় চর্যাগীতি গুলির পাঠের মধ্য দিয়ে যা সত্যিই বিস্ময়কর।বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ প্রয়োজন বা যথাযথ জানা এক্ষেত্রে কিছুটা আবশ্যক। আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় কালে চর্যাগীতির পদগুলি রচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় শুধু পরিবর্তন ঘটেনি ধর্মীয় আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটেছিল রাজবংশের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। সমগ্র পূর্ব ভারতে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। এরই সূত্রে পাল রাজত্বকালে সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের রীতিনীতি মেনে সামাজিক জীবনাচরণ দেখা গেছে। পরবর্তীকালে সেন রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনীহা দেখা যায়। এই সময়ে সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শতাব্দী অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সমগ্র ভারত ভূমিতে একসময় অনার্য জাতির বসবাস ছিল। পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশ আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, নেগ্রিটো প্রকৃতি জাতির বসবাস ছিল। এসময় উত্তর ভারতে আগত আর্যদের মনে এদের সম্পর্কে এক ধরনের দর্পিত উন্নাসিকতা ছিল। অনুমান করা হয় সপ্তম

শতাব্দীর কিছু পূর্বে গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আর্য যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল। গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ঘটেছিল পাল যুগের প্রভাব অব্যাহত ছিল। তবে জানা যায় পাল রাজারা ধর্মমতের দিক থেকে বিশেষ উদার ছিলেন। এ কারণে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান বিষয়টি পাল রাজাদের আমলে ঘটেছিল। এই সময় কালে চার বর্ণ সমাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমগাছি লিপিতে বিগ্রহপাল কে 'চাতুরবর্ণ সমাশ্রয়' অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিমণ্ডলেরও পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। বাঙালি সমাজে বর্ণবিন্যাস দূরীকরণের প্রয়াস দেখা গেল বর্মন সেন আমলে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা বল্লাল সেন সামাজিক বর্ণ বিন্যাসে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কর্ণাট আগত সেন রাজারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে হন ক্ষত্রিয়; এই সময় থেকেই তাদের পরিচয় হয় ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়।

চার বর্ণের বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থা বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ,শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত বর্ণগুলি কে বোঝায়। তবে বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ বাদে সমস্ত জাতি শূদ্র। ডোম শবর প্রভৃতি জাতিকে চার বর্ণের বাইরে অস্পৃশ্য হিসেবে ধরা হয়। এই সমস্ত পঞ্চম বর্ণ তথা অস্পৃশ্য জাতির মানুষেরা সমাজে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। বৌদ্ধ পাল রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করলেও-সেন রাজাদের আমলে বৌদ্ধদের ভূমি দানের কোন উল্লেখ নেই; বরং সেন বর্মন যুগে বৌদ্ধদের প্রতি নানাধরনের অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। উচ্চমানের ব্রাহ্মণেরা নিম্ন বর্ণের মানুষের ওপর পক্ষপাত দুষ্ট অত্যাচার করেছেন। এমন এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে চর্যাপদ গুলি রচিত হয়েছে। সামাজিক বর্ণবৈষম্য, পক্ষপাতদুষ্টতা, উচ্চ বর্ণের মধ্যে নানা ধরনের অন্যায় ও ব্যভিচার, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়- সামাজিক অবস্থার এমন টালমাটাল এর যুগেই চর্যাগীতি গুলি রচিত হয়েছে।

চর্যাগীতিতে সামাজিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক যে ভাবে ফুটে উঠেছে -

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি সমাজ বর্ণ বিন্যস্ত। এই প্রকট বর্ণবিন্যাসের যুগেই

চর্যাগীতি গুলি রচিত। নিম্নবর্ণের শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরা সমাজে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। তাদের জীবনের পরিকাঠামো তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বিপর্যস্ত, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতো। এ কারণে নিম্নবর্ণের মানুষেরা সাধারণ জনজীবন থেকে দূরে বসবাস করত। যেমন-

কাহ্নপাদের "নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।" (১০) অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোম্বীর কুঁড়েঘর। আবার শবরপাদের পদে উল্লেখিত- "উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালি।"(২৮) এবং "টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী" (৩৩)- এসব থেকে প্রমাণিত হয়, তখনকার দিনে দরিদ্র নিম্নবর্ণিত ডোম, শবর প্রকৃতি মানুষেরা গ্রামের প্রান্তে, পর্বতগাত্র কিংবা টিলায় বসবাস করত। শুধুমাত্র লোকালয় ছেড়ে দূরে পর্বতগাত্র বা টিলার উপর বসবাস নয় সমাজ জীবনে তাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। অন্না ভাব, নানা ধরনের সামাজিক অশান্তি তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী ছিল। যেমন ৩৩ সংখ্যক চর্যাতে উল্লিখিত দৈনন্দিন দুর্দশার চিত্র -

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ।।

অর্থাৎ টিলার ওপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে নেই ভাত, অথচ নিত্য আসে অতিথি। ব্যাঙের সংসার বেড়ে চলে। দোয়া দুধ পুনরায় গরুর বাটে প্রবেশ করে যায়। আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে প্রতিবেশীহীন পরিস্থিতিতে প্রতিকূলতার শেষ নেই। অবশ্য উক্ত পদের পরবর্তী পংক্তি গুলিতে অসংগতি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে-যাতে আধ্যাত্বিক তাৎপর্যের সন্ধান করা যায়। ২,৬,২০,৪৯ চর্যায় সামাজিক অসঙ্গতি, বিপর্যয়ের কথা জানা যায়।

কাহারে ঘিনি মেলি আচ্ছহূ কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।

আপণা মাংসে হরিণা বৈরী।

খণহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি।।

শিকার ছিল খাদ্য অন্বেষণের একটি উপায়। সেই শিকার চিত্রকল্প এখানে ব্যবহৃত। অবশ্য চর্যার উক্ত পদটিতে চিত্ত হরিণের অসহায় অবস্থার মাধ্যমে আধ্যাত্বিক ধর্মতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া ১০ চর্যা থেকে জানা যায় সমাজের উচ্চ কোটির মানুষের নৈতিক মান খুব উন্নত ছিল না। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ডোম, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ রমণীদের অবৈধ সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। যেমন -

নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ ।

ছোই ছোই জাইসো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।

অন্যদিকে ২৮ সংখ্যক চর্যাতে শবর শবরীর মিলিত জীবনযাত্রার মাধুর্যময় চিত্রের সন্ধান করা যায়। এইভাবে চর্যার পদগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ জীবনাচরণের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া সমাজে নারীদের অবস্থার অন্য পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ বিপর্যয়ের দিক থেকে তারা যেমন-পুরুষের সম দুঃখভোগী হত, সাধনার জগতে তাদের ভূমিকা ছিল এবং বিভিন্ন চর্যাতে সাধন সঙ্গিনী হিসেবে নারীর ভূমিকা উল্লেখিত। চর্যার পদগুলিতে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ খন্ডচিত্র সমকালের সমাজজীবনের অনেক রীতিনীতিকে আভাসিত করে। একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারের বিশেষত্ব এখানেও লক্ষিত হয়। সংসার শুধু স্বামী স্ত্রী নয়, শ্বশুর শাশুড়ি, ননদ শালিকা প্রভৃতি পরিজনদের নিয়ে যৌথ পরিবার গঠিত। কাহ্নপাদের ১১ সংখ্যক চর্যাতে উল্লেখিত হয়েছে -

মারিঅ শাসু ননন্দ ঘোড়ে সালই।

মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী।।

অর্থাৎ শাশুড়ি ননদ শালী সকল পরিজন বর্গ কে হত্যা করে কাহ্ন কাপালিকে পরিণত হল। অথচ তাদের বিবাহ হয়েছে আধুনিক জীবনের তুল্য বরপন নিয়ে, বাদ্যযন্ত্র সহকারে

বরযাত্রী, নারীর বাসর জায়গা প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ যায়নি। যেমন, ১৯ সংখ্যক চর্যায় আছে-

জঅ জঅ দুন্দহি সাদ উছলিআঁ
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলোলী।।
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম ।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।।

বিবাহ ছাড়া 'সাঙ্গা' বা 'পুনর্বিবাহ' প্রথাও সমাজে প্রচলিত ছিল। "আলো ডোম্বী তোএ সম করিব মা সাঙ্গ।" পদে তা উল্লেখিত। এছাড়া পারিবারিক জীবনের খণ্ডচিত্র হিসেবে গোপালন, দুগ্ধ দোহন, কৃষি কাজে চাষের জন্য বলদের ব্যবহারের কথা উল্লেখিত। সামাজিক বিলাস-ব্যসনে মদ্যপানের প্রচলন ছিল কিংবা কপূর দেওয়া পান খাওয়ার বিলাসিতা ছিল।

চর্যাগীতি সমূহ জীবিকা নির্বাহের দিক থেকে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত লোকেদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যে সমস্ত জীবিকার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি কায়িক শ্রমের জীবিকা এবং তেমন অর্থকারী নয়। জাতীয় বৃত্তি হিসেবে তাঁত বোনা, চাঙ্গারি প্রস্তুত করা, নৌকা বাওয়া, সম্ভবত মাছ ধরার প্রচলন ছিল। ৮,১০,১৩,১৪ সংখ্যক ও প্রভৃতি চর্যায় সকল বৃত্তির পরিচয় মেলে।

সামাজিক উৎসব আনন্দের অঙ্গ হিসেবে নাটক, নাচ গান যেমন প্রচলিত ছিল,তেমনি জীবিকা হিসেবে অর্থ উপার্জনের দিক থেকেও এগুলি স্বতন্ত্র গুরুত্ব ছিল। আবার অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে দাবা খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল। এসব থেকে চর্যাগীতি রচনার সমকালের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রীতিনীতি সম্পর্কে ধারনা করা যায়। সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালের বাস্তব জীবন যাত্রা প্রসঙ্গে নারীদের ব্যবহৃত কিছু অলঙ্কারাদি এবং গৃহস্থালি কাজে দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্রের নাম উল্লেখ করা হল এখানে। যেমন অলংকার : কানেট(কর্ণভূষণ), ঘন্টানেউর (নুপুর), কাঙ্কান (কঙ্কন), মুক্তি হার, কুণ্ডল প্রভৃতি এবং সাজসজ্জার জন্য

আরসি আয়না ব্যবহার উল্লেখিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত বাসনপত্র- হাড়ি ,পিঠা, ঘড়ি, ঘড়া, গড়লি প্রভৃতি। ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র- পড়হ, মাদল ঢোল ডমরু কাশি বীনা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে বলা যায় প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতি ধর্মীয় সংগীত হিসেবে রচিত হলেও সমকালের বাঙালি জীবনযাত্রা আচার-ব্যবহার রীতিনীতি জীবিকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয় এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালি জনজীবনের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক জীবনপ্রবাহকে সূচিত করে।

১.৭) চর্যাগীতির ভাষা

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ এর শুরুতেই উল্লেখ করেছেন- " আমাদের দেশে আর্য ভাষার সর্বস্তরের সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া। ধর্মকথা বহন করিয়াই যুগে যুগে নূতন ভাষা-সাহিত্যের সভায় আসন পাইয়াছে। বাংলাভাষার বেলায়ও ইহার অন্যথা নাই"। এতে প্রমাণিত হয় পরিপূর্ণ পরিনতি লাভের পূর্বেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রয়াস দেখা গেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতের সাধনার সঙ্গে সংযোগ রেখেই রচিত হয়েছে চর্যাগীতি গুলি। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা (NIA) হিসেবে বাংলা ভাষায় অভ্যুদয় ঘটে এবং এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা সাধারণ কথায় চর্যাগীতি। তখনো অবহট্ট এর ছাপ দূরীভূত হয়নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা চেষ্টা হয়েছে- এই কারণেই অনেকেই চর্যাগীতির ভাষাকে বাংলা বলতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচার সাপেক্ষে প্রমাণিত হয়েছে চর্যাগীতির ভাষা অবশ্যই বাংলা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার ' The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে চর্যাগীতির ভাষা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং এ ভাষাকে বাংলা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে তিনি চর্যাগীতির ভাষা প্রাচীন বাংলা বলেই অপভ্রংশী গন্ধ, কিংবা মাগধি, অর্ধ মাগধি বা শৌরসেণীর প্রচ্ছায়া কে একেবারে অস্বীকার করেননি। তার মতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় চর্যাগীতিতে সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু শৌরসেনী অপভ্রংশ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অভিজাত মহলে প্রচলিত ভাষা। সম্ভবত চর্যাগীতির পদকর্তা রাও এই ভাষা জানতেন এবং চর্যার লিপিকরেরাও বিশেষভাবে শৌরসেনী অপভ্রংশ জানতেন।

প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদ গুলি রচিত হয়েছিল সাধন সঙ্গীত হিসেবে। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সাধক কবিগণ চর্যাগান রচনা করেছেন। সহজিয়া ধর্মতত্ত্বের সকল গ্রন্থ সন্ধ্যা ভাষায় রচিত হয়েছিল। সন্ধ্যা শব্দটি ভাষার নাম হিসেবে প্রযুক্ত হলেও কোন স্বতন্ত্র ভাষা নয় -বিশিষ্ট প্রয়োগ রীতি মাত্র। শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে নানা প্রকার আলোচনা হয়েছে। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সন্ - ধা ধাতু থেকে সন্ধ্যা পদ নিষ্পন্ন করেছেন, যার অর্থ অভিপ্রেত বা অভিপ্রায়িক বচন। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও এই মত সমর্থন করে 'সন্ধ্যা' বানানের পক্ষপাতি এবং তান্ত্রিক পুঁথিপত্র ব্যবহৃত 'সন্ধ্যা' বানানটি কে লিপিকর প্রমাদ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ সালে Visva-Bharati Quarterly-তে সন্ধ্যা ভাষাকে সন্ধ্যা দেশের ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনার পশ্চিমাংশের নাম সন্ধ্যা দেশ। আর বুর্ণফ সাহেব সন্ধ্যা ভাষাকে প্রহেলিকাময় ভাষা বলেছেন এবং তিব্বতি ভাষায় সন্ধ্যা ভাষার অর্থ -প্রহেলিকাচ্ছলে দুরহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। সেখানে প্রহেলিকাময় ভাষা কিংবা আলো-আঁধারির ভাষা ইত্যাদি যাই বলা হোক সন্ধ্যা বানানটি সহজে গ্রহণ করা যায়। যেখানে সন্ধ্যা শব্দের অর্থ শুধু দিবারাত্রি সঙ্গম নয়, ' সম্যক ধ্যায়তে অস্যাম ইতি সন্ধ্যা' । মোটকথা চর্যাগীতি তে ব্যবহৃত ভাষা যথেষ্ট হেঁয়ালিপূর্ণ। কোন কবিতার মধ্যে আংশিক হেঁয়ালি, কোথাও বা সম্পূর্ণ হেঁয়ালি। যেমন দু'নম্বর কিংবা ৩৩ নম্বর চর্চা সবটাই সন্ধ্যা ভাষায় রচিত। ২নং চর্যায় বলা হয়েছে –

দুলি দুহি পিটা ধরণ ণ জাই ।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভিরে খাঅ ।।

গীতটির আদ্যোপান্ত হেঁয়ালি ভাষায় রচিত। টিকাতেও বলা হয়েছে - ' সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহুঃ ।' গুরুর উপদেশ কুম্ভক যারা ইড়া পিঙ্গলা কে বশীভূত করে বোধচিত্তকে

নিঃস্ব ভাবি কৃত করে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহজানন্দ লাভের কথা গীতটিতে ব্যক্ত হয়েছে। আর ৩৩ নং চর্যার - ' টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' পদটির মধ্যে গূঢ় ব্যঞ্জনা প্রকাশিত। সংবৃতি বোধিচিত্ত ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের স্বরূপ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিণতির কথা গীতিটিতে ব্যক্ত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ স্বরূপ বলদই জগৎ সংসারের অস্তিত্বের মিথ্যা ধারণা প্রসব করে। চর্চার বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত কিছু শব্দের লৌকিক ও সন্ধ্যাভাষার্থ নিচে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে-

চর্যার শব্দ	**লৌকিক অর্থ**	**সন্ধ্যাভাষার অর্থ**
ডোম্বী	ডোমনারী	পরিশুদ্ধ অবধুতিকা, নৈরাত্মা
সবরী	শবর নারী	নৈরাত্মা
মুসা	ইঁদুর	সংবৃতি বোধিচিত্ত
শুণ্ডিনী	শুঁড়িবৌ	অবধুতিক
যমুনা	যমুনা নদী	গ্রাহক
পুলিন্দ	কল	নপুংসক
নৌকা	নৌকা	মহাসুখকায়

চর্যাপদাবলির গানগুলি ব্রজোযানী ও সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাংকেতিক লেখা। চর্যাগীতিকোষ এর সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্ত নানাভাবে এ ভাষা কে বলেছেন - 'সন্ধ্যাভাষা'("কুক্কুরীপাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহ"), সন্ধ্যাবচন ("মুষকঃ সন্ধ্যাবচনে চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যঃ"), 'সন্ধ্যাসংকেত' ("দুলি সন্ধ্যাসংকেতে বোদ্ধব্যম্") অথবা শুধুই সন্ধ্যা ("চিত্ত-গজেন্দ্র-সন্ধ্যয়া ত্বমেবার্থং প্রতিপাদয়তি") ।

মুনিদত্তের ইঙ্গিত ধরে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার ভাষা কে বলেছেন সান্ধ্য ভাষা।ডঃ শাস্ত্রী সন্ধ্যাভাষার সঙ্গে দিন ও রাত্রির মিলনস্থল সন্ধ্যার প্রাকৃতিক অস্ফুটতার মিল খুঁজেছেন। তার কথায় - ভাগলপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ সাঁওতাল

পরগনা এবং বীরভূমের পশ্চিমাংশ এই ভূভাগ কে সন্ধা দেশ কহে, অর্থাৎ ইহা আর্যাবর্ত এবং বঙ্গদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত; এই প্রদেশের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা কহে। ..... সিদ্ধাচার্যগণের অবলম্বিত দোহা পদসকলের ভাষা এই দেশেরই সন্ধ্যাভাষা বা বিভাষা।" কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এর মত অনুসারে চর্যাপদাবলীর ভাষাকে কখনোই 'Regional Language' বা আঞ্চলিক ভাষা বা কোন বিভাষা বলা যায় না। পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে, 'সন্ধ্যাভাষা' হল লিপিকর প্রমাদ। এর যথার্থ রূপ হবে সন্ধ্যাভাষা। তার মতে, সম্-পূর্বক ধা ধাতু থেকে 'সন্ধা' শব্দের ব্যুৎপত্তি। এর অর্থ - যে ভাষায় বা শব্দের অর্থ সম্যকরূপে নিহিত আছে তা। অর্থাৎ এটি অভিপ্রেত বা উদ্দিষ্ট বা আভিপ্রায়িক বচন (Intentional speech) । ম্যাক্সমুল্যার সন্ধ্যা শব্দকে প্রচ্ছন্ন বচন (Hidden Saying) অর্থে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু সন্ধ্যা ভাষার সন্ধ্যা শব্দটি লিপিকর প্রমাদ নয়। মুনিদত্ত তার নির্মলগিরাটীকায় বারবার সন্ধ্যা শব্দটির প্রয়োগ করেছেন - আমরা পূর্বেই তা দেখেছি। সন্ধ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো - 'সম্' পূর্বক ধ্যৈ (ধ্যান করা অর্থে) ধাতু + অ + আপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে) । এর অর্থ- যে ভাষার অভীষ্ট অর্থ সম্যক ধ্যান বা অহধ্যান করে বুঝতে হয় । মুনিদত্ত ১২ সংখ্যক চর্যার টীকায় এর ইঙ্গিত দিয়েছেন - " পুনরপি তমেবার্থং দ্যুতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণচার্য্যপাদাঃ ।" "Burnof" (বুর্ণফ) সন্ধ্যাভাষাকে বলেছেন 'Le Language emigmatique' বা প্রহেলিকাময় ভাষা।

১.৮) চর্যার ভাষার পদ গঠনের রীতি

যেকোনো ভাষার মূল একক হল বাক্য, এই বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন অর্থবহ অংশ থাকে - সেগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে কিংবা অল্পস্বল্প পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য বাক্যে ব্যবহার করা যায়, যাকে পদ নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণ পাণিনি পদকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন - সুবন্ত ও তিঙন্ত । সুবন্ত পদে সুপ অর্থাৎ বিভক্তি কুলি ছিল কারক - বচন - লিঙ্গবাচক। এর মধ্যে পড়ে - ক. বিশেষ্য ও বিশেষণ; খ. সর্বনাম। অন্যদিকে তিঙন্ত পদের তিঙ অর্থে যেখানে সমাপিকা ক্রিয়ার কাল ভাব বাচ্য পুরুষ বচন বাচক

বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। এছাড়া রূপান্তর এক ধরনের পদকে পাণিনি নিপাত নামে অভিহিত করেছেন। বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও সুবন্ত, তিঙন্ত ও নিপাত - এই ত্রিবিধ পদ বিভাগ উল্লেখযোগ্য। চর্যাগীতি তে ব্যবহৃত প্রাচীন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও - ইল,-ইব প্রত্যয়ান্ত পদগুলি একসময় সুবন্ত শ্রেনীভুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তিঙন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। আধুনিক বাংলা ভাষায় এই রীতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ চর্যাগীতির পদবিন্যাস রীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার কিছু অসুবিধা হয়। তবে চর্যায় ব্যবহৃত পদগুলির পারস্পরিক অন্বয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষা সাধারণ রীতির সন্ধান করা যায়। যেমন

ক. বিশেষ্য বিশেষণ অন্বয় : বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণের অবস্থান বাংলা ভাষার সাধারন রীতি, যা চর্যাতেও দেখা যায় – চঞ্চল চীএ (১), নিঅড় জিণউর (১২) প্রভৃতি। কৃন্দন্ত, সর্বনামীয় ও সংখ্যাবাচক বিশেষণের ক্ষেত্রে বিশেষণ সর্বদা পূর্বে বসে। যেমন – ভবণই গহন গম্ভীর বেগে বাহী।

খ. সাধারণ বাংলা ভাষার রীতি অনুসারেই সম্বন্ধ পদের অন্বয় দেখা যায়। কখনো কখনো এর ব্যাতিক্রমও দেখা যায়। যেমন – রুখের তেন্তলি কুম্ভিরে খাঅ (২), করণক পাটের আস (১), ইত্যাদি।

গ. নিপাত এর নঙর্থক অব্যয় বিশেষ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত পরে বসে। যেমন, হাড়ীত ভাত নাহি (৩৩), অপণে নাহি (৩৭)ইত্যাদি। এর ব্যাতিক্রম প্রয়োগ – নাহি বিছ ণালি (১৮); নাহি পড়বেষী (৩৩)ইত্যাদি।আবার ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধারণত রীতি নঙথক অব্যয়ের পূর্ব নিপাত দেখা যায়। যেমন – হরিণা হরিণীর নিলঅ না জানী'।(৬), তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই না পাণী (৬)ইত্যাদি।

চর্যার ভাষার শব্দচয়ন ও বাগধারার ব্যবহার :

চর্যাগীতির ভাষার মধ্যে শৌরসেনী অপভ্রংশের বেশকিছু প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন নিষ্ঠান্ত অতীতকালের শব্দরূপে – কিউ, বিআপিউ, গউ, বিকসউ ইত্যাদি এবং সর্বনামের ক্ষেত্রে –

জো, সো, জসু, তসু, জইস প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া নেপালে মৈথিল ভাষার ব্যবহার প্রচলন থাকায় এর মত মৈথিল শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে চর্যাগীতিতে। চর্যায় ব্যবহৃত শব্দ গুলি তিন রীতির - তৎসম, তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম। তবে বানানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের শৈথিল্য দেখা যায়। এমন কি তৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রযোজ্য। এছাড়া একই বানান বিভিন্ন পদে ভিন্নরূপে দেখা গেছে। যেমন – শান্তি>সান্তি; কবালী>কাবালী, মঝ>মাঝ, পঞ্চ>পাঞ্চ ইত্যাদি।এই ধরনের বিভিন্ন তার অন্যতম কারণ লিপিকর-প্রমাদজনিত । আবার কিছু শব্দের বানানের ক্ষেত্রে যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীকৃত রূপ দেখা যায়। যেমন – নিয়ড্ডি> নিয়ড়ি, সূদু>সুজ ইত্যাদি। আর চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত বাগভঙ্গিমা বা বাগধারা বাংলা ভাষার পরবর্তী পর্যায়কেই স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন- গুণিয়া লেহু, ধরণ ন জাএ, কহন ন জাই, নিদ গেলা, আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, হাড়ীত ভাত নাহি ইত্যাদি বাগর্থের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

১.৯) চর্যাগীতির ভাষার সাংকেতিকতা

চর্যাগীতির ভাষার বিশেষ একটি নাম আছে- সান্ধ্য ভাষা।এই সন্ধ্যা ভাষা কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয় ,একটি ভাষার বিশিষ্ট সাংকেতিক প্রয়োগ রীতি মাত্র।বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মাচরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় রাখতে ভাষার ক্ষেত্রে এই গোপন রীতি প্রয়োগ করতেন। এই সাংকেতিকতা আসলে কোড ল্যাংগুয়েজের মত ।কোন শব্দের অর্থের পাশাপাশি একটি গোপন অর্থ রয়েছে ।' হেবজ্র তন্ত্র' গ্রন্থে সান্ধ্য ভাষার সাংকেতিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে -"সন্ধ্যা ভাসং মহৎ ভসং সময় সংকেত বিস্তরম।"আবার এই ভাষার সাংকেতিকতা কে অনুধাবন করে উপলব্ধি করতে হয়। তাই বলা হয়েছে ' সম্যক ধ্যায়তে অস্যাম ইতি সন্ধ্যা।' লুইপাদ রচিত ১ নম্বর চর্যাগীতি তে বলা হয়েছে

" কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চী এ পইঠো কাল।।"

অর্থাৎ ,কায়া রূপ তরুবর ,পাঁচটি তার ডাল /চঞ্চল চিত্ত মাঝে আসি কাল।

সাংকেতিক ভাবে এই দুই পংক্তিতে বৌদ্ধ নৈরাত্মবাদ ও অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ কর্তৃক জগৎ

সংসারের প্রতি সৃষ্টির দর্শন সম্মত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ৪৫ সংখ্যক চর্যায় মনকে তরুরূপে কল্পনা করা হয়েছে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কে তার শাখা বলা হয়েছে-

"মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।"

কুক্কুরীপা বিরচিত গবড়া রাগনির্ভর ২ নম্বর চর্যায় বলা আছে

"দুলি দুহি পিটা ধরন না জাই।

রুখের তেন্তলি কুম্ভিরে খাও।।"

এখানে কুম্ভক যোগ দ্বারা সহজানন্দ উপভোগের বিষয় বর্ণিত আছে ।সাংকেতিকতা এখানে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। কুম্ভক ইড়া পিঙ্গলা কে বশীভূত করে চিত্ত নিঃস্ব ভাবসম্পন্ন করতে পারলে সহজানন্দ লাভ করা সম্ভব।বিনষ্ট দ্বৈত জ্ঞানে মনিপুর চক্র ভেদ করি শক্তি কুম্ভকে ঊর্ধ্বগামী হয়। এই চিত্ত সংবৃতি অবস্থায় অবধূতিকা ভীত হয় ;কিন্তু প্রকৃতির দোষ মুক্ত সহজানন্দ অবস্থায় অবধূতিকা মহাসুখ চক্রে প্রবেশ করে।

গুর্জরি রাগে চাটিল পাদের "ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী" এই ৫ নম্বর চর্যায় নৌকা ও সাঁকো নির্মাণের রূপকে বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্বের মূল কথা ও অধ্যায় সাধন তত্ত্বের কথা সাংকেতিকভাবে বলা হয়েছে।৬ নম্বর পদে ভুসুকু পাদের " কাহারে ঘিনি মেলি অচ্ছ হু কীস" পদটিতে হরিণ-হরিণী রূপকের বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনার মূল তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। শবর পাদের ২৮ নম্বর চর্যা পদে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ সবরী বালী"পদে শবরী,শবর, গঞ্জরিমালী শব্দগুলির অর্থ প্রাণবায়ু, নৈরাত্মা, গুহ্য মন্ত্র রূপ। এরকমভাবে ৩৩ সংখ্যক পদে ঢেণঢণ পাদ এর" টালত তো মোর ঘর নাহি পড়বেষী" পদটিতে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ও সাধন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে । টালত অর্থে শীর্ষস্থানীয় মহাসুখে চক্র কে বোঝায় ।এই পদের 'বলদ ','গাভী 'প্রভৃতি শব্দগুলির সাংকেতিক অর্থ এবং শূন্যতা। এভাবেই চর্যাপদ গুলির মধ্যে শব্দ ও ভাবনা গত সাংকেতিকতা বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে এবং সাধন তত্ত্ব

সাধন প্রণালীর সন্ধান করে নিয়েছে বৌদ্ধ সাধকরা। এখানেই হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় চর্যাগীতির স্বতন্ত্র।

১.১০) চর্যার কাব্যমূল্য

মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। লিখিত রূপে সেই ভাষার প্রকাশে সাহিত্য রচিত হয়। এভাবেই খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর এই সময় কালে বাংলা ভাষার ধর্মীয় সংগীত রচিত হয়েছিল। সেগুলি চর্যাগীতি নামে পরিচিত।এখানে ধর্মীয় তত্ত্ব ও দর্শনের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে পদগুলিতে রয়েছে সমকালের বাঙালির সমাজ ও জনজীবনের স্বরূপ। সাহিত্য অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতির যোগান দেয়। সেই পাঠ মানুষের মনে রস সৃষ্টি করে এবং তার ফলে অনুভূতি জাগে।এভাবেই রসের সৃজন ঘটে সাহিত্যে । সাহিত্য এককালে সৃষ্টি হয় কিন্তু তা শুধু সেকালের জন্যই নয়। আজ চর্যাগীতি গুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে গিয়ে সমকালের পাঠকের মনে কেমন উপলব্ধি অনুভূতি ঘটেছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। চর্যাগীতির মত তত্ত্ব প্রধান ব্যাখ্যাযোগ্য কাব্য থেকে সহজে রসোপলব্ধি করা সম্ভব নয় কারণ আধুনিক কালের বিচারে বলে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে যার মূল্য যতখানি ধর্মীয় সংগীত হিসেবে কতখানি এর অবদান রয়েছে।চর্যাগীতির পদগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যত আধ্যাত্মিক হোক না কেন তাকে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে তা আমাদের জীবনে বিশেষ পরিচিত। বিবাহ যাত্রা, যুদ্ধযাত্রা ,নৌযাত্রার বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এগুলি পরিপূর্ণ সৃষ্টি করতে না পারলেও পাঠকের চিত্তে রস সঞ্চার করে এবং আনন্দের অনুভূতি জাগায়। সে ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগের গভীর প্রকাশের চিত্র অনেক পথে পাওয়া যায় যেমন প্রেম নিবেদনের বিশেষ ভঙ্গি

আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ...
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।।

দার্শনিকতা ও ধর্মীয় তাত্ত্বিক স্বরূপে চর্যাগীতি গুলি অবশ্যই সহজিয়া সাধনা অন্তর্গত। বাঙালি জীবনে সহজিয়া সাধনা বিশেষভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে সাধারণ

দৈনন্দিন জীবন চিত্র এমনভাবে আভাসিত হয়েছে যে সঙ্গত ভাবেই রসাস্বাদন ঘটে থাকে। যেমন ৬ সংখ্যক চর্যা হরিণ শিকারের রূপকল্পে লিখিত হয়েছে

তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী।

হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ যানী।।

আবার দৈনন্দিন কর্মজীবনে নেশার প্রয়োজনে মদ বিক্রয়শালার চিত্র এবং প্রবল বেগে প্রবাহিত নদী পারাপারের চিত্র ভক্তির মাধ্যমে রসে রসের উদ্বোধন হয়েছে।

আবার চিত্র সৌন্দর্যের উপভোগ্য রূপক কিছু খুঁজে পাওয়া যায় । যেমন

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅনত লাগেলী ডালী।

একেলী শবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।।

এখানে শবর শবরীর মিলনের এক অনবদ্য চিত্র পরিস্ফুট করা হয়েছে। নানা ধরনের তরুবর মুকুলিত বনভূমিতে বসন্তের সমাগমে শবরী যুবতী ময়ূরপুচ্ছ,গুঞ্জ মালা, কর্ণকুণ্ডলে সুসজ্জিত হয়ে একাকী বিচরণ করছে । শবর সজ্জা রচনা করে রাত্রি যাপন করছে ।এ পদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যাই থাক না কেন বাহ্যিক কাব্যসৌন্দর্য বহিরঙ্গ উপাদান পাঠকে মুগ্ধ করে। এই দিক থেকে পদের মধ্যে যে কাব্য প্রকাশিত হয়েছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

দেশ ও বিদেশের অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য চর্চায় জীবন কাহিনীর বর্ণনা অধিক এ কাব্য আবেদন জানায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় কবিকণ্ঠে উচ্চারিত "সঙ্গম বিরহ বিকল্প বরমিহবিরহ" ।চর্যাগীতির সাধকরা ও জীবনধারণের এই তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

যেমন ৩৩ সংখ্যক চর্যায় ঢেণঢণ পাদ বলেছেন "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী/ হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।"এই পদে সাংসারিক দুঃখের অভিঘাত স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য গুলিতে নারীর মুখে তাদের দুঃখের কথা ধরা পড়েছে বারমাস্যায়, কিন্তু প্রাচীন যুগে নারীর দুঃখের আভাস পাওয়া গেছে চর্যাগীতি গুলিতে।

"হাউ নিরাসী খমণ ভতা।/ মোহর বিগোআ কহণ ণ জাই।।

ফেটলিউ গো মাএ অন্ত উড়ি চাহি।/জা এথু চাহম সো এথু নাহি।।"

নারীর দুঃখ প্রকাশের আশ্রয়স্থল তার মাতা। চরম দুঃখের দিনে মাকে সম্বোধন করে সে দুঃখ প্রকাশ করে ।দুঃখের অভিঘাতে নারীর মাতৃত্বের পূর্ণতা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার স্বামী বিবাগী। বাসনার প্রথম সন্তান প্রসব হয়েছে কিন্তু আঁতুর নাই। এ পদের আধ্যাত্বিক তাৎপর্য থাকার পাশাপাশি নারীর দুঃখের অনুভূতির তীব্রতা রয়েছে।

নারীর দুঃখ প্রকাশের আশ্রয়স্থল তার মাতা। চরম দুঃখের দিনে মাকে সম্বোধন করে সে দুঃখ প্রকাশ করে ।দুঃখের অভিঘাতে নারীর মাতৃত্বের পূর্ণতা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার স্বামী বিবাগী। বাসনার প্রথম সন্তান প্রসব হয়েছে কিন্তু আঁতুর নাই। এ পদের আধ্যাত্বিক তাৎপর্য থাকার পাশাপাশি নারীর দুঃখের অনুভূতির তীব্রতা রয়েছে।

চর্যাগীতির আঙ্গিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায় কবিতাগুলি ছন্দ অলংকার প্রয়োগের। জন সাধারণের কাছেও মনোরম কবিতা উপহার দিতে চেয়েছিলেন চর্যার কবিরা । পদ নির্মাণে কখনো গ্রামীণ শব্দ বা চলিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ধর্মীয় সাধন সংগীত হিসেবে এবং একই সঙ্গে কবিতা হিসেবেও সার্থক।

১.১১) চর্যাপদের গীতিধর্মিতা

'চর্যা' শব্দটির প্রচলিত অর্থ আচার-আচরণ তবে সাধারণ মানুষের আচার-আচরণ নয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক বর্গের মানুষের জীবনাচরণ বা আচার ব্যবহার । সাধন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই অর্থে চর্যা শব্দটির ব্যুৎপত্তি কাহ্নপাদের ভাবনা অনুসারে 'দুষ্কর ব্রতচারন', যাকে টীকাকার মুনিদুত্ত বলেছেন - সর্বপ্রকার প্রপঞ্চ মুক্ত আচরন। অর্থাৎ সাধনার গোপন আচরন। চর্যাপদ কবিদের হাতে গানের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'এ ছোট ছোট খন্ড বা প্রকীর্ণ কবিতা আছে ।এরপরে অবহটঠ থেকে আগত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ সহজিয়া সাধকদের রচিত ধর্ম বিষয়ক কবিতা ।বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতাগুলির সঙ্গীত ধর্মের কথা মাথায় রেখে সম্পাদনা কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন-'চর্যাগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাংলা গান ।' পদগুলি বাহ্য রূপ ও ভাবের

দিক দিয়ে বিচার করে আরো লিখেছেন- 'গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তন গানের মত,গানের নাম চর্যাপদ। সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে তখন চর্যাপদ বলিত।'

বাংলা ভাষার সৃষ্টি লগ্নে গান বা গীতিকা প্রচলিত ছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে রচিত লুইপাদের 'লুইপাদ গীতিকা' দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের 'বজ্রাসন বজ্রগীতি',চর্যাগীতি, কৃষ্ণাচার্য্যের 'বজ্রগীতি' সরহের ' দোহাকোষগীতি' প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এর সময়কাল রচিত চর্যাগুলির সঙ্গীতধর্ম উল্লেখযোগ্য। চর্যায় উল্লেখিত ৫০ টি গানের মধ্যে রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখিত মোট রাগরাগিণীর সংখ্যা ১৬ টি । সেগুলো হলো পটমঞ্জরী, গবড়আ, অরু, গুঞ্জরি, দেবক্রি, দেশাখ, কামোদ, ধনসই, রামক্রি, মালসী, বঙ্গাল, ভৈরবী প্রভৃতি ।সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পটমঞ্জরী ।১১ টি পদে পাওয়া যায়। বেশির ভাগই ছিল হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীত জাতীয়। চর্যাতে উল্লেখিত রাগরাগিণীর উল্লেখ সংগীত এর যথার্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু চর্যাগীতি গুলির গায়ন রীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়না। রাজেশ্বর মিত্র তার 'বাংলা সংগীত' গ্রন্থে প্রথম এই কথা উল্লেখ করেছেন।শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' এ চর্যাগীতি সম্পর্কের আলোচনা আছে। গায়নরীতি ধ্রুবপদ সম্ভবত সম্মিলিতভাবে গাওয়া হতো এবং প্রত্যেক পদ গাইবার পর ধ্রুবপদ গাওয়া বাধ্যতামুলক ছিল। এসব থেকে চর্যার সংগীত ধর্ম ও গায়নরীতি সম্পর্কে ধারণা জন্মায়।

১.১২) অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. চর্যাগীতি আবিষ্কার ও তার গুরুত্ব আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২.চর্যাগীতির সাধন তত্ত্ব ও ধর্মীয় তাত্ত্বিক দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৩. চর্যাপদের পদ বর্ণনা অনুসারে তৎকালীন সমাজ চিত্র সম্পর্কে আলোচনা ক।

প্রশ্ন ৪. চর্যাগীতির কাব্যমূল্য অথবা সাহিত্যমূল্য আলোচনা করো।

মন্তব্য

প্রশ্ন ৫. চর্যাপদের গীতিধর্মিতা ব্যাখ্যা কর।

১.১৩) গ্রন্থপঞ্জি

১. 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২. 'চর্য্যাপদ' মণীন্দ্র মোহন বসু, কমলা বুক ডিপো

৩. 'চর্যাগীতি পরিচয়' সত্যব্রত দে, জিজ্ঞাসা

৪. 'চর্যাগীতি' তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৫. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি, প্রথম খণ্ড

একক ২ । চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

২.১) পদ সংখ্যা ১

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

২.২) পদ সংখ্যা ৫

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

২.৩) পদ সংখ্যা ৬

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

২.৪) পদ সংখ্যা ৮

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

২.৫) পদ সংখ্যা ১৪

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা ও আধুনিক বাংলা রূপান্তর

২.৬) অনুশীলনী

২.৭) গ্রন্থপঞ্জী

পদ বিশ্লেষণ

২.১। ১ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ পটমঞ্জুরী । লুইপাদানাম ।।

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠে কাল।।

দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ।

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।

সউখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করনক পাটের আস।

সুনুপাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।।

ভণই লুই আমহে সাণে দিঠা।

ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

চীএ < চিত্ত। দিঢ় < দৃঢ়। করিঅ < করিত। মহাসুহ <মহাসুখ। পরিমাণ <পরিমাণয়।

সঅল < সকল। নিচিত < নিশ্চিত। এউ <এতদ। পাতের<পাটন>পাট। ধমণ <বান।

চ্যবন <চ্যবন >চমণ।

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

এই প্রথম চর্যায় আচার্য লুইপাদ মানব দেহকে পাঁচটি শাখাযুক্ত তরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পাঁচটি শাখা হলো বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চস্কন্ধ - রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান; অথবা গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কেও কায়াতরুর পাঁচটি শাখা বলা যায়। আমাদের এই দেহাশ্রিত মন ' প্রকৃত্যাভাস দোষবশাৎ' বা প্রকৃতি আভাস দোষহেতু সদা চঞ্চল । প্রাকৃত বিষয়ের আকর্ষনে চিত্ত চঞ্চল হয় বলে আমরা বিবিধ দুঃখভোগ করে কাল কবলিত হই। চঞ্চল মনের কাল ভোর থেকে ও বৃত্তিমূলক ভগবোধ বা সংসার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিত্তের চঞ্চলতা দূর করে মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ করার জন্য দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। চঞ্চল চিত্তকে নিঃস্ব বিকৃত করে মহাসুখে তাকে বিলীন করার সাধনা গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে হবে। সবিকল্প নির্বিকল্প সমাধি সমূহ দ্বারা ভগবোধের বা দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। কারণ সমাজে সকল দ্বারা ক্ষণিকের জন্য দুঃখের প্রভাব থেকে চিত্তমুক্ত হয়। কিন্তু ব্যুত্থান বা সমাধিভঙ্গে সুখ দুঃখের সব অনুভূতি আবার চিত্তে ফিরে আসে। ফলে সংসারের সব সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। পরিণামে মৃত্যু নিশ্চিত।

তাই চিরস্থায়ী মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ করতে হলে বাসনার বন্ধন এড়াতে হবে।

'ছান্দকবন্ধ' বলতে টিকার মুনিদত্ত 'মোড্ডিয়ান' প্রভৃতি বন্ধের কথাও বলেছেন। ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব বা পারিপাট্যের আশা ও ছাড়তে হবে। শূন্যতার পক্ষ বা বাসনা নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করতে হবে। শুন্যতার বোধ হলো আদিতে অনুৎপন্ন জগতের অসারতার উপলব্ধি। চর্তুথানন্দ বা সহজানন্দ উপলব্ধি করতে হ'লে প্রবৃত্তি মূলক ভগবোধ এবং নিবৃত্তিমূলক শূন্যতাবোধ উভয়ের অদ্বয় সামরস্য সাধন করতে হবে । লুইপাদ বলেছেন, তিনি ধমন চমন, অর্থাৎ নিঃশ্বাসবাহী নাড়ী বা প্রশ্বাস বাহি নারী বা আলি কালি, বা লোকজ্ঞান বা লোকভাস, বা গ্রাহ্য বা গ্রাহক, উভয়ের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে পিঁড়িতে বসেছেন, যাতে মধ্যস্থ অবধূতীমার্গ রুদ্ধ হয়ে না যায়। এই অবস্থায় সাধক আর ভব-বিকল্পাদির দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি তখন কুম্ভক যোগে ধ্যানস্ত থাকেন এবং সহজস্বরূপের যুগনদ্ধ রূপ দেখেন।

ঘ) আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

কায়া (রূপ) তরুবর। ডাল পাঁচটি। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হ'ল । দৃঢ় করে মহাসুখ পরিণাম কর । লুই ভনে (বলে), গুরুকে পুছে (জিজ্ঞাসা করে) জানো। সকল সমাধি দিয়ে কি করা যায় ? সুখদুঃখে নিশ্চিত মরতে হবে। ছন্দের বন্ধন, করণের (ইন্দ্রিয়ের) পটুত্বের আসা এড়াও (ত্যাগ করো) । শূন্যতা পক্ষের দিকে ভিড়ে পাশে নাও । লুই ভণে (বলেন), আমরা ইশারায় (পাঠান্তরে ঝাণে=ধ্যান) দেখেছি। ধমন-চমন (নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস/গ্রাহ্য ও গ্রাহক) দুই পিঁড়িতে বসেছি ।

২.২ । ৫ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ গুরজুরী। চাটিল্লপাদানাম ।।

ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।

দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহ।।

ধর্মার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।

পারগামিলোঅ নিভর তরই।।

ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।

আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।।

সঙ্কামত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।

নিঅডডী বোহি দূর ম জাহী।।

জই তুমহেলোঅ হে হোইব।

পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

ণই < নদী। বেগেঁ <বেগ। বাহী <বাহিঅই >বাহিএ। চিখিল< চিখিল্ল >চিখিল।

মাঝে <মধ্য >মজঝ >মাঝ। ধর্মার্থে <ধর্ম >ধাম। বোহি < বোধি। জাহী <জা=জা+হি >জাহী।

লোঅ <লক।সামী <স্বামী।

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

এই চর্যায় বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব দুয়েরই কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে এই জগত আদিতে অনুৎপন্ন সুতরাং প্রাতিভাসিক । এর কোন যথার্থ সত্তা নেই। কিছু আপেক্ষিক ও নিয়ত পরিবর্তনশীল ধর্ম সংস্কারের যোগেই ভব জগতের অস্তিত্ববোধ । এই ভব বা অস্তিত্ব প্রবাহ প্রবাহিণী নদী স্বরূপ। এতে দিবারাত্র বিষয়ে তরঙ্গ উঠছে ও লয় পাচ্ছে। তাই এটি গহন ও ভয়ঙ্কর । এর দুদিকেই প্রকৃতি দোষের পঙ্ক এবং মধ্যেও থৈ মেলেনা। অতএব এই ভবপ্রবাহ পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ।

ঘট-পট-স্তম্ভ-কুম্ভাদির মতো ভূতবিকারই ভবের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে এর কোন অস্তিত্বই নেই। সাধারণতঃ তা বোঝা যায় না বলে সিদ্ধাচার্য চাটিল এই ভবপ্রবাহ পার হবার জন্য একটি সাঁকো গড়লেন। পরগামি লোকেরা নিশ্চিন্তে সেই সাকোয় চড়ে ভবনদী

পার হতে পারবে। গুরুর নির্দেশিত মধ্যমার্গ বা অবধূতিকা মার্গে বিচরণ করলেই ভবনদী পার হয়ে নির্বানের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।

এই সাঁকো তৈরিতে চিত্তে অধিষ্ঠিত মোহরূপ তরুকে ফেড়ে, অর্থাৎ চিত্রের বিষয় গ্রহ খন্ডন করে,তরুর পাটাগুলি কে জ্ঞানের আলোয় জোড়া হয়েছে। তারপর অদ্বয়জ্ঞানরূপ টাঙ্গি বা কুঠার এর সাহায্যে নির্বাণ সুদৃঢ় করা হয়েছে। এই সেতুর উপর উঠে বা মেয়ে ও দক্ষিণে ঢোকা চলবে না; অর্থাৎ আলী কালি, ললনা রসনা, শশী সূর্য প্রভৃতি গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। বোধি বা পরম জ্ঞান, বা সহজানন্দ নিকটেই (অর্থাৎ দেহের মধ্যেই) ; এর জন্য দূরে যাবার দরকার নেই। অর্থাৎ নাভি চক্রে বোধিচিত্তের উদ্বোধন হলে ক্রমেই 'বোধি বা মহামুদ্রা সিদ্ধি' বা সহজানন্দ লাভ করা যাবে। ইড়া ও পিঙ্গলা রূপী বামগা ও দক্ষিণ গা নাড়ীর শ্বাস-প্রশ্বাস কে সংযত করে তাকে মধ্যমার্গ বা অবধূতিকা মার্গে ঊর্ধ্বগামী করতে হবে। তবেই সিদ্ধি বা নির্বাণ লাভ হবে।

যারা এই সাঁকোয় চড়ে পারে যেতে চায়, তারা শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ যোগী, বা সেরা সাই চাটিল কে এর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করবে। অন্য যোগীরা তার মত এই সাধনা পন্থা জানেন না।

ঘ) আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

গহন গম্ভীর ভবনদী বেগে বয়। দুই প্রান্তে কাদা, মাঝে থই নেই। ধর্মের জন্য চাটিল সাকো গড়ে , পারগামী লোক নিশ্চিন্তে পার হয়। ফারা হল মোহতরু, পাটি জোড়া হল। অদ্বয় দৃঢ় টাঙ্গী নির্বাণে হানা হল। সাকোয় চড়লে ডান-বাম হইও না। নিকটেই বোধি, দূরে যেওনা। ওহে, যদি তোমরা সবাই পারগামী হবে, তবে শ্রেষ্ঠ সাই গুরু চাটিল কে জিজ্ঞাসা করো।

২.৩ । ৬ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ - পটমঞ্জুরী। ভুসুকপাদানাম

কাহেরে ঘিণি মেলি আচ্ছহু কীস।

বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদী।।

আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

তিন ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।।

হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী।

হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিঅ তো।

এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্ত।।

তঁরসঁন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।

ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঈ।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

কাহারে <কস্য >কাহ +এরে। ঘিনি <গৃহ্নত্বা>ঘিণিআ >ঘিণি। কীস <কীদৃশ>কীইস>কীস।

হাক <হাক্ক। পড়অ <পড়ই। চৌদীস <চতুর্দিশ>চউদীস >চউদীস। আপণা <আত্মনস্য

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

এই চর্যায় দেখা যায় হরিণ শিকারের রূপকে সাধক চিত্তে সাংবৃতিক অবস্থা থেকে পারমার্থিক অবস্থা উত্তরণের কথা বলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অবস্থায় চিত্ত নানা প্রকৃতি দোষে দুষ্ট হয় জরা-মরণ, সুখ-দুঃখ পূর্ণ অনিত্য জগত প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। পারমার্থিক অবস্থায় চিত্ত প্রকৃতিদোষ ও অবিদ্যা বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়। তখন তা প্রকৃতি প্রভাব স্বরূপ রূপে আনন্দময় সহজ স্বরূপে স্থিত হয়। হরিণ হরিণী ও শিকারের রূপকে চিত্তের এই দুই অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই পদে চঞ্চলতার জন্য সাধকের সাংবৃত্তিক চিত্র হরিণ এবং ভবগ্রহ হরণ করে বলে পারমার্থিক চিত্ত হরিণ রূপে কল্পিত হয়েছে।
পদের প্রথমাংশে পদকর্তা সাধক বলেছেন - মৃত্যু মারাদি দ্বারা আবেষ্টিত হয়ে আমার সাহিত্যিক চিত্ররূপ হরিণ মারমার শব্দ শুনে ছিল। এখন সৎ গুরুর চরণ রেনু প্রসাদে ওই আবেষ্টনী ত্যাগ করে সর্ব ধর্মের অনুপলব্ধি এবং গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবের অভাব হেতু আমি হরিণ রুপি নৈরাত্মা কে গ্রহণ করে মুক্ত হয়েছি। হরিণ নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য নিজেরই শত্রু, তাই শিকার কবলিত হয়। তেমনি সাংবৃত্তিক চিত্ত প্রকৃতিদোষ ও অবিদ্যার প্রভাবে যে জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, সেই অলীক জগত রূপ আত্ম সৃষ্টিই চিত্তের সব দুঃখের

কারণ। একথা বুঝতে পেরে সাধক ভুসুক সদগুরুর বচন রূপ বাণ দ্বারা তাকে প্রহার করতে বিরত হননি। এইরূপ আগাতে প্রবুদ্ধ হয়ে সাধক চিত্ত তার পারমার্থিক স্বরূপ বুঝতে পারল। তাই আহার পানরূপ সকল জাগতিক ভোগ ছেড়ে হরিণী রুপা নৈরাত্মা বিপদশূন্য স্থানে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কিন্তু নৈরাত্মা হরিণের নিরাপদ আবাস ইন্দ্রিয়দ্বারে জানা যায় না বলে সে তার সন্ধান পায়নি। সাংবৃত্তিক চিত্ত হরিণের এই বিপন্ন অবস্থা বুঝে নৈরাত্মা দেবী রূপ হরিণী তাকে ডেকে বললেন - " রে চিত্তহরিণ, এই কায়বন পরিত্যাগ করে যাবতীয় ভবমোহ ছেড়ে, ভয় শূণ্য মহাসুখ কমলবনে গিয়ে নির্বিকারে বিচরণ করো।" এই কথা শুনে হরিণ এত স্ত্রোত্র গমন করল যে তার খুরের উত্থান-পতন দেখা গেল না। অর্থাৎ, চিত্ত তীব্র গতিতে অবধূতী মার্গে উঠে মহাসুখ ও কমলে যখন প্রবেশ করল, তখন আর তার সাংবৃত্তিক রূপ দেখা গেল না। ভুসুক বলেন, যারা বস্ত্রশাস্ত্রাভিমানী পন্ডিত, তারাও এই উষ্ণীষকমলে সহজানন্দ স্বরূপ জানেন না। তাই তাড়া মূঢ়। তাদের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে না।

ঘ) আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

কাকে নিয়ে, কাকে ছেড়ে, কিভাবে আছি। চারদিক বেড়ে হাক পড়েছে। আপনার মাংসে হরিণ আপনার শত্রু। ভুসুক ক্ষণকালের জন্যও শিকার ছাড়েনা। হরিণ ঘাস ছোয়না, জল পান করে না। হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না। হরিণী বলে হরিণকে - "ফেরারী তুই শোন, এ বনছেড়ে পলাতক হ"। ত্রস্তগমনে হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুক বলে মূঢ়েঢর হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

২.৪। ৮ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ - দেবক্রী । কম্বলাম্বর পাদানাম।।

সোনে ভরিতি করুণা নাবী।

রুপা থৈ মহিকে ঠাবী।।

বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।

গেলী জাম বহুউই কইসেঁ।।

খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি।

বাহতু কামলি সদ্ গুরু পুচ্ছি।।

মাঙ্গত চনহিলে চউদিস চাহঅ।

কেডুয়াল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।।

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।

বাটত মিলিল মহাসুহ স(সু)ঙ্গা।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

সোনে-সুবর্ণ >সোণ+এ। ভরিলি-ভরিত >ভরিঅ+ইল=ভরিল+ঈ। ঠাবী-স্থায়। জাম-জন্ম। উপাড়ী- উৎপাটিত >উপপাডিঅ >উপাড়ী।কাচ্ছী -কক্ষিকা >কচ্ছিআ >কচ্ছি। কেঁ>কেন। মাগা- মার্গ>মাগগ>মাগ। সঙ্গা <সঙ্গ।

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

এই চর্যাতে সহজসাধনার আপাতগোপন সাধন প্রনালীর দূরূহতম ক্রিয়াকলাপ সন্ধ্যাভাষার আবরণে ঢেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সন্ধ্যাভাষার আবরণ সৃষ্টির জন্য নৌবাণিজ্যের উৎপ্রেখ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। চর্যাটি বাংলাদেশের প্রাচীন বাণিজ্যিক সম্রদ্ধি এবং তার অপর ভিত্তি গড়ে ওঠা পরবর্তীকালের সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগসুত্রের ইঙ্গিত দেয়। 'সোনা' ও 'রূপা' শব্দদুটি দুটি অর্থ ব্যঞ্জক। 'সোনা' শব্দে শূন্যতা এবং 'রূপা' শব্দে রূপ-বেদনা-সংস্কার-বিজ্ঞানকে বোঝান হয়েছে। 'করুণা' শব্দের দ্বারা বোধিচিত্তকে বোঝানো হয়েছে। অবধূতিমার্গে বোধিচিত্তের উর্দ্ধাভিসার হেতু তাকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।কবি তার সহজসত্যের স্বরূপ উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। সিদ্ধিলাভের পন্থা বর্ণনায় তিনি খুঁটি উপড়ে কাছি খুলে দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়ার সন্ধ্যার্থে সহজসাধনার প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতাটির সুচনায় কবি বলেছেন যে, জৈব জীবনের মোহ ত্যাগ করা উচিত এবং আত্মার মুক্তি সাধনার দ্বারা জন্মান্তর গ্রহনের সম্ভাবনা রহিত করা

উছিত।তিনি মনে করেন, এই দেহ-তরুণীকে শূন্যতায় নিবৃত্তিবোধে পরিপূর্ণ করে রাখলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ-জগৎ আর দেহে স্থান পাবে না। রূপাতীত অতীন্দ্রিয়লোকের উপলব্ধির জন্য নৌকা চালানোর বৈঠা হ'ল বাসনার বন্ধন। সৎগুরুর পরামর্শে খুঁটি উপড়ে ফেলে কাছির বন্ধন ছিন্ন করে মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে নৌকা চালাতে হবে। নৌকা চালানোর বৈঠা হ'ল সৎগুরুর পরামর্শ।বৈঠা ভাল চালাতে না পারলে নৌকা চালানো সম্ভবপর নয়।যাত্রাপথে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বিপদের সম্ভাবনা এড়িয়ে ডান-বামে চেপে স্রোতের মধ্যপথ অবলম্বন করে দেহতরণী পরিচালনা করলে কাম্য অনুভূতি মহাসুখের সঙ্গে পথিমধ্যেই সাক্ষাৎ হবে।কম্বলাম্বরপাদের এই পদটির অন্তরর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করলে বোঝা যায় এই সাধক কবি কি অমিত কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন।

ঘ) আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

সোনায় ভরা করুণা নৌকা। রূপা রাখার ঠাই নেই।বেয়ে যাও কামলি গগন উদ্দেশে। গত জন্ম ঘুরে আসে কি ক'রে। খুঁটি উপড়ে কাছি ছেড়ে দিয়ে। বেয়ে যাও কামলি সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে। গলুইতে চড়ে চারদিকে তাকায়। কেড়ুয়াল নেই, কেউ কি বাইতে পারে ? বাম ডান চেপে পথের সঙ্গে প্রবিষ্ট করো। পথে মিলল মহাসুখসঙ্গ।

২.৫। ১৪ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ - ধনসী । ডোম্বী পাদানাম ।।

গঙ্গা-জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।

তহি বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই।।

বাহ তুঁ ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।

সদগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিনউরা।।

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধি।

গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি।।

চান্দ সূজ্জ দুই চাকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।

বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা।।

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।

জো রথে চড়িলা বহিবা ন জাই কুলে কুলে বুড়ই।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

গঙ্গা-যমুনা = গ্রাহ্য- গ্রাহক। মাতঙ্গী= সহজযান মত্ততা হেতু হস্তিনি রূপে কল্পনা করা অবধুতি। যোইআ= যোগেন্দ্র। উছারা= উচ্ছ্রিত >উছর-বেলা অতিক্রান্ত। তুলনীয় উছোর হয়েছে বেলা (ধর্মমঙ্গলে আছে)। পাঅপএঁ=পাদ প্রসাদে। গঅণ দুখোল = গগন বা শূন্যতা রূপ সেউতি। চান্দ সুজ্জ= চাঁদ প্রজ্ঞা ও সূর্য অদ্বয় জ্ঞানের প্রতীক।

গ) মর্মার্থ ও আধুনিক বাংলা রূপান্তর

গঙ্গা যমুনার মাঝখানে ওরে নৌকো বাওয়া হয়। তাতে নিমজ্জিত মাতঙ্গী যোগীকে অবহেলায় পার করে দেয়। ডোমনি, তুমি নৌকা বেয়ে চল।ডোমনি নৌকা বেয়েই চল। পথে দেরি হল। সদগুরু প্রসাদে আমি আবার জিনপুর যাব। পাঁচটি বইটা পড়ছে, মার্গে অর্থাৎ (এখানে যা পিছনের গলুইয়ে) পীড়া কাছি আছে বাঁধা। গগন সেঁউতিতে জলসেচ। (যেন নৌকায় জোড়ার ফাঁকে জল) না প্রবেশ করে। চাঁদ সূর্য দুই চাকা সৃষ্টি সংহারকারী পুলিন্দা(অর্থাৎ মাস্তুল), ডানদিক বাঁদিক দুই গন্তব্য পথ অর্থে মার্গ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর,বেয়ে চল। ডোমনি কড়ি নেয়না। স্বেচ্ছায় পার করে দেয়। যে রথে চড়ল, সে নৌকা বাইতে জানলো না ।সে কূলে কূলে ঘুরে ডুবে মরে।

২.৬) অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. প্রথম চর্যাগীতি টি কার রচিত? পদটির সাধন তত্ত্ব আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২. পঞ্চম সংখ্যক চর্যাগীতি টি কার রচিত?এখানে ভবনদীর রূপক একইভাবে জীবনের কথা বলা হয়েছে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৩.ভুসুকুপাদ রচিত ৬ নম্বর চর্যার সাধন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো।

মন্তব্য

প্রশ্ন ৪. কামলির অপর নাম কি? তাঁর রচিত চর্যাগীতির সংখ্যা কত? বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন তত্ত্ব কিভাবে এই পদটিতে ফুটে উঠেছে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৫. ১৪ সংখ্যক চর্যাগীতি তে গঙ্গা-যমুনা কিসের প্রতীক? পদটি কোন সিদ্ধাচার্য রচিত? এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো।

২.৭) গ্রন্থপঞ্জি

১. চর্যাপদ ,জ্ঞানের আলো, ঢাকা

২. 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা' সুমঙ্গল রানা, ফার্মা কে। এল। এম

৩. 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৪. 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' নির্মল দাস, আলফা

একক ৩ । চর্যাপদের পদ বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

৩.১) পদ সংখ্যা ২১

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ ও আধুনিক বাংলা রূপান্তর

৩.২) পদ সংখ্যা ২২

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

৩.৩) পদ সংখ্যা ২৮

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

৩.৪) পদ সংখ্যা ২৯

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

৩.৫) পদ সংখ্যা ৪২

ক) মূলপদ

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

গ) মর্মার্থ

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

৩.৬) অনুশীলনী

৩.৭) গ্রন্থপঞ্জী

৩.১। ২১ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ বিরাড়ী।। ভুসুকুপাদম।।

নিসি অন্ধারী মুসার চারা।

অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা।।

মার রে জোইআ মুসা পাবনা।

জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা।।

ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।

চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী।।

কাল মুসা উহ ণ বাণ।

গঅণে উঠি করঅ অমণ ধাণ।।

তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।

সদগুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল।।

জবেঁ মুসাএর চার তুটঅ।

ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

নিসি অন্ধারী= রাত্রি অন্ধকারময়ী। নিশি স্ত্রীলিঙ্গ বলে স্ত্রীলিঙ্গে অন্ধারি। ভখঅ=সং।ভক্ষ্য। মুসার চারা= মূষিকের বিচরণ। বিন্দারঅ=বিদ্ধকারি। খণঅ= খনন করে। উঞ্চল পাঞ্চল= হাঁচোর পাঁচোর করা । মুষাএর= মূষিকের।

গ) মর্মার্থ ও আধুনিক বাংলা রূপান্তর

রাত্রি অন্ধকার, মূষিক বিচরণশীল। অমৃতভক্ষ মূষিক আহার করে। পবনের মত চঞ্চল মূষিককে, হে যোগী, তুমি মার ।এতে যেন তার আনাগোনা উঠে যায় অর্থাৎ বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবী বিদ্ধকারী মূষিক গর্ত খনন করে, এই মূষিক চঞ্চল- এটা জেনে তাকে নাশ করার জন্য স্থিতিশীল হও। মূষিক কৃষ্ণবর্ণ, তার উদ্দেশ্ ও গায়ের রঙ দেখা যায়না। গগনে ওঠে সে অমনস্ক ধ্যান করে বা বৃত্তি অনুসারে অমৃত পান করে। সেই মূষিকের ততক্ষণ চঞ্চলতা যতক্ষণ না সে সদগুরুর উপদেশে অর্থাৎ বোধে নিশ্চল হয়ে যায়। ভুসুকু বলছেন যখন মূষিকের বিচরণ বন্ধ হয়ে যায় তখন তার বন্ধন খুলে যায়।

৩.২। ২২ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ - গুঞ্জরী । সরহপাদানাম।।

আপণে রচি রচি ভব নির্বানা।

মিছে লোঅ বান্ধবএ আপণা।।

অম্ভে ন জাণহুঁ অচিন্ত্ জোই।

জাম মরণ ভব কইসণ হোই।।

জইসো জাম মরণ বি তইসো।

জীবন্তে মঅলে ণাহি বিশেসো।।

জা এথু জাম জাম মরণে বি সঙ্কা।

সো করউ রস রসাণেরে কংখা।।

জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।

তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি।

জামে কাম কি কামে জাম।

সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

অপণে -আত্মনেন(=আত্মনা)। মিছে- মিথ্যা >মিচ্ছা > মিছা। অম্ভে- অসমাভিঃ >অমহহি >অমহে> অম্ভে।জইসো < যাদৃশ। মঅলে - মৃত । করউ >করোত। তিঅস <ত্রিদশ। ধাম <ধর্ম।

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

এই চর্যায় কবি জগতের অনিত্যতা বিষয়ে তার বিশ্বাস জিরো ভাবে ঘোষণা করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে তার বিশ্বাস ছিল আত্মা অবিনশ্বর, কিন্তু পথটিতে সেই বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে বলেছেন, মানুষেরা নিজনিজ ও কল্পনার দ্বারা ভব ও নির্বাণের পার্থক্য দেখে। বস্তুত অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব বলে কিছু হয়না। সবই মানুষের রচনা, স্বকপোলকল্পনা । সেই কল্পনার ফলে মানুষ ভ্রান্তভাবে জগতের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে ।

কবি সরহপাদ বলেন যে, তিনি অচিন্ত্য যোগী। মনের চিন্তা শক্তিকে তিনি রুদ্ধ করেছেন। তাই তার কাছে জন্ম মৃত্যু বা অস্তিত্ব দুর্বোধ্য। তার কাছে জন্মও যা মৃত্যুও তা-ই। জীবিত থাকা বা মৃত্যু দুই তার কাছে অ পৃথক। কোনটাই কোন বিশেষত্ব ভূষিত নয়।

ঐহিকতাবাদীদের উল্লেখ করে সরহপাদ বলেছেন যে, যারা মৃত্যু ভয়ে ভীত, যারা সত্তার জড়ত্ব প্রাপ্তির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, তারা রস রসায়নাদি বা নানা ধরনের ঔষধ এর সাহায্যে বার্ধক্য ও মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে চায়, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। কেউ কেউ আবার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও স্বর্গে গিয়ে অমর হবার জন্য এই পার্থিবজীবনে জপ-তপস্যা -ধ্যান- পূজার্চনা তীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি পূণ্য কর্মে সময় অপচয় করে। কিন্তু এইসব কৃত্যাদি ভস্মে ঘি ঢালার মতো। সরহপাদ মনকে কখনো সক্রিয় হতে দেয় না। তার ধর্ম অচিন্ত্য। সেই ধর্মে আস্থা ও বিশ্বাসের প্রেরণায় তিনি জন্মে ও কর্মে নিহিত কোন কার্যকারণ সূত্র কে অনুস্যুত বা বিদ্যমান থাকতে দেখেন না। তার মতে,জীবনের সেরা প্রাপ্তি সহজানন্দ লাভ করতে হলে লৌকিক জগতের যাবতীয় কার্যকারণ সূত্রকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করতে হবে। জন্মানুসারে কর্ম কি কর্মানুসারে জন্ম, এইরকম আড়ম্বরপূর্ণ বাগবিভ্রমের বিচারে কবির বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, তাই উভয় বিকল্পই তার কাছে মূল্যহীন।

ঘ) আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

নিজেই ভবর্নিমাণ রচনা করে করে লোকে মিথ্যাই নিজেকে বদ্ধ করে। অচিন্ত্যজোগী আমরা, জানিনা জন্ম-মরণ-ভব কেমন করে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই। জীবিত মৃতের মধ্যে বিশেষ নেই। জন্ম-মরণেও এখানে যার শঙ্কা সে রসরসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। যারা সচরাচর ত্রিদশ ভ্রমন করে তারা অজর অমর কিছুই হয় না। জন্মে কর্ম জন্ম, সরহ বলে অচিন্ত্য ধর্ম।

৩.৩। ২৮ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ বলাড্ডি । শবরপাদানাম ।।

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।

মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।

ণিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী।।

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।

একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।।

তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।

সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী।।

হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।

সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।।

গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মণে বাণেঁ ।

একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ পরম নির্বাণেঁ।।

উমত সবরো গরুআ রোষে।

গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

উঞ্চা উঞ্চা< উচ্চ উচ্চ। পাবত<পর্বত>পব্বত। তঁহি <তস্মিন >তমহি>তঁ্ম>।

পীচ্ছ< পুচ্ছ। গুলি< ঘূর্ণ। গুহাড়া < গোহার(গরু হরণকালীন চিৎকার)।

পম্ম< প্রেম>পেম্ম। কাপুর< কর্পুর> কপপুর। উমত< উন্মত্ত।

গ) মর্মার্থ

এই চর্যায় শবর ও শবরীর প্রেম মিলনের রূপকে নৈরাত্মা দেবীর সাহায্যে সহজ সাধকের মহাসুখলাভের রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে সাধক যোগীন্দ্রের দেহকে পর্বতশিখরে সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সুমেরু পর্বতের অবিদ্যার তরু নানা বিষয়ে আনন্দে মুখরিত হয়ে রয়েছে। আর এর পঞ্চস্কন্ধ শাখা-প্রশাখা শূন্যতাকে স্পর্শ করেছে। তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এই দেহপর্বতের মস্তক রূপ মহাসুখ শিখরে সাধকের নিজ গৃহিণী রূপ নৈরাত্মা

দেবির বাস।তিনি নানাবিধ ভাব বিকল্প রূপের ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বাইরে নিজের স্বরূপ অলংকৃত করে রেখেছেন এবং গ্রীবাদেশে সম্ভোগ চক্রে গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জমালা ধারণ করে আছেন। ধর্মকায় থেকে উৎপন্ন বলে বোধিচিত্ত রূপ শবর প্রকৃতপক্ষে বজ্রধর। কিন্তু এখন সংবৃত্তি হেতু পাগল। তিনি বিষয় বিহ্বল অবস্থায় রয়েছেন বলে নৈরাত্মাকে নিজের প্রেয়সী রূপে চিনতে পারছেন না। তখন নৈরাত্মা সাধক তাকে ডেকে বলছে উন্মত্ত পাগল শবর, ভুল করোনা। আমি তোমার নিজেরই গৃহিণী, বা স্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ সহজসুন্দরী। সর্বসঙ্গবিরহিতা নৈরাত্মা সহজসুন্দরী এই কায় পর্বত বনেই জ্ঞান মুদ্রা রূপ কুণ্ডল কানে পরে আর কণ্ঠে বজ্র রূপ শূন্যতাকে নিয়ে সহজানন্দে বিহার করে। অবিদ্যা প্রপঞ্চকে তার মধ্যে অনুভব করতে হয়।

নৈরাত্মার নির্দেশ পেয়ে শবর সাধক পরিশুদ্ধ কায়-বাক-চিত্ত-রুপ ত্রিধাতুর খাট পাড়লেন।তার ওপর মহাসুখস্বরূপ শয্যা বিছিয়ে নৈরাত্মা দেবীর প্রেমে প্রথমে অবিদ্যা প্রপঞ্চ রূপ রাত্রি কাটালেন। তারপর প্রভাস্বর চিত্তরূপ তাম্বুল মহাসুখ রূপ কর্পুরের সঙ্গে আহার করে চিত্তকে অচিত্ততায় বিলীন করলেন। তখন নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখজ্ঞানরশ্মি এই অবস্থায় পৌঁছায়, রজনি নাশ হয়। সাধককে এই অবস্থায় পৌঁছতে হলে গুরুর উপদেশ রূপ ধনুকে নিজের বোধিচিত্ত রূপ বান জুড়ে এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ করতে হবে।চর্যাগীতিকার শবরপাদ এভাবে গুরুবচন দ্বারা তার বোধিচিত্তকে নির্বাণ লাভের দিকে নিয়ে গেছেন। এই অবস্থায় তার বোধিচিত্ত সহজানন্দপানে উন্মত্ত হয়ে রয়েছে। জ্ঞানানন্দ চালিত হচ্ছে। মহাসুখচক্ররূপ গিরিশিখরে প্রবেশ করছে। এখানে তার বোধিচিত্ত এমনভাবে লীন হয়েছে যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাধকের বোধিচিত্তের এই অবস্থাই সহজানন্দ মগ্নতা বা পরম নির্বাণ।

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

উঁচু উঁচু পাহাড়। সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। পরণে ময়ুরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর ভুল করো না। দোহাই তোমার নিজের গৃহিণী, নাম সহজ

সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হল। ওরে গগনে লাগল তাদের ডাল। একাকিনী শবরী এ বন খুঁজে বেড়ায়। কানে তার কুণ্ডল ,কণ্ঠে ধারণ করে আছে বজ্র। তিন ধাতুর খাট পড়ল। শবর,শয্যা বিছানো হল। তাতে শবর নাগর, নৈরামনি নাগরী। প্রেমলীলায় রাত্রি পোহাল। হৃদয় তাম্বুল কর্পুর সহ মহাসুখে খায়। শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে হিয়ে মহাসুখে রাত কাটায়। এক শরসন্ধানে বিদ্ধ কর,পরম নির্বাণের জন্য। উন্মত্ত শবর গুরু যুক্ত রোষ মুক্ত।গিরি শিখরসন্ধিতে প্রবেশ করলে শবরের খোঁজ মিলবে।

৩.৪। ২৯ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ পট মঞ্জরী । লুইপাদানাম ।।

ভবন হোই অভাব ণ জাই।

আইস সংবোহেঁ কোপতিআই।।

লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।

তিঅ ধাএ বিলসই উহ ন জানা।।

জাহির বানচিহ্নরূব ণ জাণী।

সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।।

কাহারে কিষ ভণি মই দিবি পরিচ্ছা।

উদক চান্দ জিম সাচ না মিচ্ছা।।

লুই ভণই ভাইব কীষ

জা লই অচ্ছম তাহের উহণ দীস।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

সংবোহে =সম্মোধন, সম্যক বোধের সাহায্যে। পতিআই= প্রত্যয় করে। বিণানা= বিজ্ঞান। তিঅধাএ= তিন ধাতুর(কায়, বাক্,চিত্তের) দ্বারা। বানচিহ্নরূপ= বর্ণ, চিহ্ন, রূপ। পরিচ্ছা=প্রশ্ন,জিজ্ঞাসা । উহ ণ দীস = না উদ্দেশ্য, না দিক।

গ) মর্মার্থ

কেউ কেউ মনে করেন জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং সম্যক বোধের দ্বারা তারা বিশ্বাস করেন, জগতের অভাবেও কিছু লোপ পায়না। কিন্তু এই বোধের দ্বারা কি সহজানন্দের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জন্মাতে পারে! সহজানন্দের বিজ্ঞান আলাদা। তা ইন্দ্রিয়াতীত। তাই কায় বাক চিত্তের সাহায্যে যারা অতীন্দ্রিয় অনুভুতি ব্যাখ্যা করেন, তারা ঠিক জানেন না। যুক্তিবাদীরা হৃদয়ের অনুভূতির ধার দিয়ে যান না। সুতরাং যুক্তি দিয়ে যারা পৃথিবীতে মিথ্যে বলেন, যুক্তির মাধ্যমে যারা সহজানন্দ কে পেতে চান- তারা আনন্দের রহস্যময় অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। যার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, যার বর্ণ-চিহ্ন রূপ সবই বর্ণনার অতীত এবং আমাদের অজ্ঞতাকে কি বেদ বা শাস্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ।জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ যেমন সত্য না, মিথ্যাও নয়- যোগীর হৃদয় জগত সম্বন্ধে ধারণা ও তেমনি না সত্য না মিথ্যা। আসলে যতক্ষন যুক্তির প্রাধান্য, ততক্ষনই সংশয়ের প্রাধান্য। চিত্তকে যদি অচিত্ততায় লীন করা যায়, যুক্তির চেয়ে অনুভূতিকে বড় করা হয়- তবেই যোগী অতীন্দ্রিয় সহজানন্দে লীন হতে পারেন। লুইপাদ এই অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন বলেই তিনি দিশেহারা।

ঘ) আধুনিক বাংলা রূপান্তর

ভাব না হয়, অভাব না যায়। এমন সংবোধকে বিশ্বাস করে লুইপাদ বলছেন, বাপু (মূর্খ শিষ্যকে সম্মোধন করে) বিজ্ঞানের দূর লক্ষ্যকে তিন ধাতুতে বিলাস করে তাকে জানা যায়না। যার বর্ণ রূপ কিছু জানা যায় না, তা আমি কেমন করে আগম বেদের দ্বারা ব্যাখ্যা করব! কাকে আমি কি বলে প্রশ্নের উত্তর দেবো! কারণ জলে প্রতিভাত চন্দ্র না সত্য না মিথ্যা। লুইপাদ বলছেন, আমি কি ভাববো, যা নিয়া আছি তার না জানি উদ্দেশ না জানি দিক।

৩.৫। ৪২ সংখ্যক চর্যা

ক) পদপাঠ

রাগ - কামোদ। কাহ্নপাদানাম ।।

চি অ সহজে শূণ সংপুন্না।

কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না।।

ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।

ফরই অনুদিনং তৈলোএপমাই।।

মুটা দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।

ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর।।

মুটা অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।

দুধ মাঝেঁ লড় নচ্ছংতেঁ দেখই।।

ভব জাই ণ আবই এসু।

আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই।।

খ) ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

সংপুন্না< সম্পূর্ণা। হহি-হো। বিসন্না <বিশন্ন। তৈলোএ <ত্রৈলোক্য। কাঅর <কাতর। সাঅর <সায়র। পেখই < প্রেক্ষতে। কাহ্নিল = কান্ন। কোই <কোহপি।

গ) মর্মার্থ ব্যাখ্যা

আলোচ্য চর্যায় কবি কাহ্নুপাদ আত্মার অবিনাশিতার কথা বলেছেন। তার মতে মানুষের মন যদি সহজানন্দ পূর্ণ হয়ে জগতের অনিত্যতা বুঝতে পারে, তাহলে পঞ্চস্কন্ধাত্মক জ্ঞানের আধার এই দেহের বিনাশ হলেও বিষাদগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। দেহের বিনাশ এই সত্তা বিলুপ্ত হয় একথা বলা যায়না।জলবিন্দু যেমন মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যায় ঠিক তেমনি এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহও বিলীন হলে ক্ষুদ্র সত্তা পরিত্যাগ করে তিন ভুবনে প্রচলিত বিশ্ব সত্তায় প্রবেশ করে সর্বদা প্রকাশিত হবে। দৃষ্ট বস্তুর বিনাশ দেখে তত্ত্ব জ্ঞান হীন মূঢ়রাই কাতর হয়। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়লেই যেমন অর্ণব জলহীন হয় না, তেমনি যে অস্তিত্ব দৃশ্যমান তার বিনাশ হলেই পারমার্থিক সত্তার বিনাশ ঘটে না। দুধের প্রতি বিন্দুতে ননী থাকলেও তেমন দেখা যায় না, তেমনই মানবত্মা দেহের অবলম্বন ছেড়ে

দিলেও তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। বিদ্যমান পারমার্থিক সত্তাকে তত্ত্বজ্ঞানহীন মুঢ় দেখতে পায়না। ভবরোগে স্থূল অস্তিত্বের সৃষ্টি বা বিনাশ সত্য নয়। অস্তিত্বের শুধু বাহ্যিক রূপান্তর ঘটে। এই উপলব্ধির প্রজ্ঞায় কবি কাহ্নপাদ জগতের দুঃখ বা মৃত্যু কোন কিছুতেই বিচলিত হন না। আনন্দময় উপলব্ধিতে বোধহয় থেকে জগতের অবিনশ্বরতায় কৃৎ প্রত্যয় হয়ে সিদ্ধাচার্য যোগী কাহ্ন সর্বক্ষণ সহজানন্দে বিলাস করেন।

ঘ) আধুনিক বাংলায় রূপান্তর

সহজ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ শূন্য। স্কন্দ বিয়োগে বিষন্ন হইওনা। কেমন করে বল কাহ্ন নাই। ত্রিলোক ব্যপ্ত করে অনুদিন সে প্রকাশিত। দৃষ্ট বস্তু নষ্ট দেখে মূঢ় কাতর হয়। ভঙ্গ তরঙ্গ কি সাগরকে শোষণ করে। মুঢ় বিরাজমান কেও দেখতে পায় না, যেমন দুধের মধ্যে ননী থাকলেও দেখা যায় না। এইভাবে কেউ যায় না আসেনাও। এইভাবে বিলাস করে যোগী কাহ্ন।

৩.৬) অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. একুশ সংখ্যক চর্যাপদের পদকর্তা কে? এই পদটির সাধন তত্ত্ব আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২. শবরপাদ রচিত ২২ সংখ্যক চর্যার আধুনিক বাংলা রূপান্তর এর সাহায্যে মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ৩. শবরপাদের ২৮ সংখ্যক চর্যার রূপকার্থ আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৪. ২৯ সংখ্যক চর্যাপদে লুইপাদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন তত্ত্ব কিভাবে বর্ণনা করেছেন?

প্রশ্ন ৫. ৪২ সংখ্যক চর্যাপদে কাহ্নপাদ বর্ণিত সান্ধ্য ভাষায় রচিত পদটির গুঢ়ার্থ আলোচনা করো।

৩.৭) গ্রন্থপঞ্জি

১. চর্যাপদ ,জ্ঞানের আলো, ঢাকা

২. 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা' সুমঙ্গল রানা, ফার্মা কে। এল। এম

৩. 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৪. 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' নির্মল দাস, আলফা

একক ৪। চর্যাপদের কবি

বিন্যাস ক্রম

৪.১) চর্যার কবি

ক) লুইপাদ

খ) কুক্কুরীপা

গ) ভুসুকুপাদ

ঘ) কাহ্নপাদ

ঙ) সরহ পাদ

চ) শবরপাদ

ছ) শান্তি পাদ

৪.২) অনুশীলনী

৪.৩) গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ চর্যার কবি

প্রাচীন বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদ।তখন প্রতিটি কবিতায় ভনিতা দেওয়ার রীতি ছিল। অতীতে পাওয়া সাড়ে ৪৬ টি পদের মধ্যে ২৮ টি গীতিতে স্পষ্ট ভনিতা রয়েছে এবং ১৮ টিতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এক্ষেত্রে পদের মধ্যে এমন কিছু ইঙ্গিত আছে যার থেকে পদকর্তার নাম অনুমান করা যায়। যেমন পঞ্চম সংখ্যক চর্যাতে চাটিল নামটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা চলে পদকর্তার নাম চাটিল। মুনিদত্তের থেকেও এই অনুমানের সমর্থন মেলে। তবে উল্লেখ্য বিষয় মুনিদুত্ত তার টীকায়

অনেক কবির নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গানের মাথায় ভুসুকুপাদানাম,চাটিলপাদানাম ইত্যাদি লেখা আছে এবং তার প্রথম বাক্যটিতে কবির নাম উল্লিখিত আছে। ১,২ ও ১০ সংখ্যক গীতে গানের মাথায় কবির নাম নেই । ১৩ সংখ্যক গীতে টিকারম্ভে কবির নাম নেই, টীকার মধ্যে একাধিকবার কৃষ্ণাচার্যের নাম এসেছে। ভণিতা ও মুনিদুত্তের টীকার উল্লেখ মিলিয়ে চর্যাপদে মোট ২৩ জন পদকর্তা বা রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন তার "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"(প্রথম খন্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে আমরা সর্বসমতে কুড়িজন রচয়িতার নাম পদবী ছদ্মনাম পাইতেছি।" একথা যথার্থ নয় ।২৩ জন পদকর্তার নাম ও পদ সংখ্যা উল্লেখ করা হলো আজদেব(১), কঙ্কন(১), কামলি(১), কাহ্নপাদ(১৩), কুক্কুরিপাদ(৩),গণ্ডূরীপাদ(১), চাতিল(১), জয়ানন্দি(১), ডোম্বী(১),ঢেন্ঢন(১), তান্তি(১), তাড়ক(১), দারিক(১), ধাম(১), বিরুঅ(১), বিনা(১),ভাদে(১), ভুসুকুপাদ(৮) শান্তি(২),মহিআ(১),শবরপাদ(২), সরহপাদ(৪) এবং লুইপাদ(২)

ক) লুইপাদ

লুইপাদকে চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। চর্যার সংগ্রহটি তাঁর পদ দিয়েই সূচিত হয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আদি সিদ্ধাচার্য ধরা হলেও রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহ পাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলে উল্লেখ করতে চান। কিন্তু প্রাচীনত্ব বিষয়ে লুইপাদকে গ্রহণ করতে হয়। চর্যাপদ রচনা ছাড়াও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর সহায়তায় 'অভি-সময়-বিহঙ্গ' গ্রন্থ রচনা করেন। তার অন্য দুটি গ্রন্থ হল 'শ্রী ভগবতভিসময়' ও 'তত্ত্বস্বভাব- দোহাকোষ- গীতিকাদৃষ্টিনাম'। অনুমান করা হয় দশম শতাব্দীর কোন একসময় তার জন্ম এবং তিনি মগধের অধিবাসী ছিলেন। সুকুমার সেন ' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(প্রথম খন্ড) গ্রন্থে জানিয়েছেন 'লুই' শব্দের অর্থ 'রোহিত'শব্দ থেকে উদ্ভূত। ধর্মমঙ্গলের নায়কের নাম লুইয়া । লুইপাদের নামটি হয়তো পৌরাণিক কল্পনা। তবে একথা যথার্থ ধর্ম পুজায় তাকে ভক্তি করা হয় এবং তার পূজা প্রচলিত আছে। অন্য মতে লুইপাদ ওড়িশা বা বাংলাদেশে জন্মগ্রহন করেন। চর্যাগীতি ২ অ ২৯ সংখ্যক পদ তাঁর রচনা।

খ) কুক্কুরীপা

কুক্কুরিপা সম্পর্কে খুব কম জানা যায়। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। চর্যাতে তার দুটি কবিতা পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি অন্য গ্রন্থ রচনা করেন। সুকুমার সেন জানিয়েছেন "তিব্বতীয় ঐতিহ্যে কুক্কুরিপাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি একটি নেড়ি কুকুর পুষিতেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে নামটি সংস্কৃত 'কুক্কুটীপাদ'শব্দের বিকৃতি। সংস্কৃত অর্বাচীন সাহিত্যে এক কুক্কুটিপাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।ইনি কোন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না। যেসব পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি সবরকম শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিতেন তাহাদের উপহাস করিয়া বলা হইত কুক্কুটপাদ অর্থাৎ মুরগির মত যারা এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের আঁচড় দিয়া খুটিয়া খুটিয়া খায়।"

গ) ভুসুকুপাদ

বিভিন্ন কিংবদন্তির থেকে জানা যায়, ভুসুকু নামটি ছদ্মনাম।এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত শান্তিদেবের জীবনীতে উল্লেখ আছে তিনি ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র।কিছুদিন মগধে সেনাপতি পদে থাকার পর শেষ জীবনে নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে বসবাস করতেন।ভজনে,শয়নে ও কুটিতে শান্তভাবে থাকতেন বলে ভুসুকু নামে অভিহিত হত। এই অর্থে তাঁর পুরো নাম রাউত ভুসুকু।ভুসুকু ছিলেন বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত।কেউ কেউ অনুমান করেন তিনি সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অন্য মতে চর্যার গীতিকার ভুসুকু লুইপাদের পরবর্তী কবি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নন। এদিক থেকে ভুসুকু নাম নিয়ে সংশয় আছে। পদ এর প্রমাণে তিনি বাঙালি ছিলেন।

আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী।

ভুসুকুর গানে সেকালের অতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছবি পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সাধক।

ঘ) কাহ্নপাদ

চর্যাগীতি সংগ্রহে কাহ্নপাদের পদসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি ।তিনি মোট ১৩ টি পদ রচনা করেছেন। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার কবি ও সাধকদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তার জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তারানাথ একাধিক কাহ্নপাদের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্তত দু'জন কৃষ্ণাচর্য বা কাহ্নপাদের অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। পন্ডিত কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদ দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো একসময় আবির্ভূত হয়েছিলেন।'হেবজ্র পঞ্জিকা' অনুসরণে একথা প্রমাণিত হয়।

ঙ) সরহ পাদ

তিব্বতের প্রাচীন সাধকদের নাম তালিকার গ্রন্থমালা 'সরোজবজ্র','পদ্মবজ্র' রাহুলভদ্র প্রভৃতি নামের অন্তরালে বজ্র ও সরহের সন্ধান পাওয়া যায়।এই গ্রন্থগুলি থেকে অনুমান করা হয় বজ্রতন্ত্রের প্রবক্তা তিনি এবং আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীনতম কবি সরহ। দোহা কোষে সরহপাদ রাজা রত্নপালকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। অনুমান করা যায় সম্ভবত দ্বাদশ শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন ।তিনি একাধিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ, দোহাকোষগীতি এবং চর্যাগীতি রচনা করেছিলেন।

চ) শবরপাদ

চর্যাপদের উল্লেখিত পদকর্তা শবরপাদ এবং সিদ্ধাচার্য শবর ভিন্ন ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সিদ্ধাচার্য শবর সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন । 'তেঙ্গুর" গ্রন্থমালায় 'বজ্রযোগিনীসাধনা' 'মহামুদ্রা বজ্রগীতি' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু পদকর্তা শবরপাদ ও সিদ্ধাচার্য দুজনেই শবর জাতীয় ছিলেন। প্রচলিত জনশ্রুতি আছে তার দুই স্ত্রী - লোক ও গুণী। রহুল সংকৃত্যায়ানের মতে শবরপাদ সরহের শিষ্য ও

ছ) শান্তি পাদ

চর্যাগীতি সংকলন গ্রন্থে শান্তি পাদের দুটি পদ রয়েছে। শান্তি নামধারী একাধিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যের নাম পাওয়া যায়। তবে পদকর্তা শান্তি তাদের থেকে আলাদা ব্যক্তি বলেই মনে হয় । রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে শান্তি পা মগধে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিদ্যা অর্জনের পর কিছুকাল সোমপুর বিহারের বর্তমান যা বাংলা সেখানে ছিলেন। তিনি সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন এবং প্রায় ৯০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাই চর্যার শান্তি পাদ ইনি নন। পদকর্তা শান্তির আবির্ভাব সম্ভবত পরে এবং তিনি ছিলেন ভুসুকুর শিষ্য। চর্যাগীতির অন্যান্য পদকর্তাদের বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। যেমন পদকর্তা দারিক লুইপাদের শিষ্য বলে পরিচিত এবং বিভিন্ন পদে তার সমর্থন পাওয়া যায়। বিরুআ নামটি মূলত সংস্কৃত 'বিরুপক'।গুন্দুরি,চাটিল,জয়নন্দি ও তাড়ক-এই পদকর্তার নাম তিব্বতি ঐতিহ্যে পাওয়া যায়না। অনুমান করা হয় চট্টগ্রামের অধিবাসী হিসেবে চাটিল নামটি গৃহীত হয়েছে। এবং তাড়ক সম্ভবত ছদ্মনাম ও উপাধি। ডোম্বীপা ত্রিপুরার রাজা এবং বিরুআর শিষ বলে পরিচিত। পদকর্তা মহিআ ছিলেন কাহ্ন পাদের শিষ্য এবং ঢেণ্ঢন পাদকে বলা হয় যে কাহ্নপার বংশধর। কারন ঢেণ্ঢন তিব্বতি উচ্চারনে হয় ধেতন। তিব্বতি ঐতিহ্য বলা হয় কাহ্নের বংশধর।

৪.২) অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. চর্যাগীতির সাধন তত্ত্ব আলোচনা করে দুজন পদকর্তার আবির্ভাব কাল, কাব্য চর্চা নিয়ে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২. লুইপাদ, ভুসুকুপাদ ও কাহ্নপাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪.৩) গ্রন্থপঞ্জি

১. 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২. 'চর্যাগীতি' তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী

৩. 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' নির্মল দাস, আলফা

৪. 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথম খন্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স

৫. 'বাঙালির ইতিহাস' আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পরিয়াম

একক ৫। বৈষ্ণব পদাবলী

বিন্যাস ক্রম

৫.১) উদ্দেশ্য

৫.২) পদাবলীর বিষয়

৫.৩) বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চরস

ক) শান্ত রস

খ) দাস্য রস

গ) বাৎসল্য রস

ঘ) সখ্য রস

ঙ) মধুর রস

৫.৩) অনুশীলনী

৫.৪) গ্রন্থপঞ্জী

৫.১) উদ্দেশ্য

বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী সব বাঙালী পাঠকের প্রিয় পাঠ।মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর পাঠকের মনে রসসঞ্চার করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় বৈচিত্র,ভাব,ভাবের নতুনত্ত,ভক্তিবাদ পাঠককে আকৃষ্ট করে। এর পূর্বে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাঙালি পাঠকের মনে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত স্বরূপ" বোধের জাগরন ঘটিয়েছিল। তারই সম্পূর্ণ রসবস্তু হয়ে ওঠে বৈষ্ণব পদাবলী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শ ও দর্শনের প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীকে রোমান্টিক ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত করে উচ্চতর ভক্তি মার্গে উত্তীর্ণ করে। দ্বৈতবাদী এই

দর্শনের প্রভাব সাধন ভজনকে দেশ কালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ করে তলে।এই পদাবলীর রাধা কৃষ্ণকেন্দ্রিক রসভাসের পশ্চাতে ভিন্নতর আধ্যাত্ম সাধনার ব্যাঞ্জনা রয়েছে।এর মধ্যে গীতিকবিতার সুর অনুরণিত হতে দেখা যায় যা কবিমানসের সচেতন প্রজ্ঞার ফসল না হলেও পরবর্তী কালের গীতিকবিতার পথপ্রদর্শক ।

৫.২) পদাবলীর বিষয়

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গলীলা এবং বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণের লীলা নিয়ে বিশাল কায়া এই বৈষ্ণব পদাবলী রচিত যা বাংলা সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেক পদকর্তার পদে নীলাচলে কৃষ্ণপ্রেমময় চৈতন্যের ভাবচিত্র ধরা পড়েছে।

কৃষ্ণ লীলার দুটি পর্যায় রয়েছে। ক) বাল্যলীলা খ)মধুর লীলা

বাল্যলীলার মধ্যেই পড়ে গোষ্ঠলীলা । চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তারা জয়দেব ,বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের অনুসারী। তাঁরা রাধা কৃষ্ণ লীলার মধুর রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নতুন দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সুস্পষ্ট ।চৈতন্যের তিরোধানের পর তাঁর বাল্যলীলা, কৈশোর, সন্ন্যাস, দিব্যোন্মাদ জীবনালেখ্য রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলার আলোকে বর্ণিত।

৫.৩) বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চ রস

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে জনপ্রিয়তা ও কাব্যমূল্য বিচারে বৈষ্ণব পদ গুলি সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। বৈষ্ণবদের উদার মানবিকতাবোধ, মানব মনের শাশ্বত কিছু আর্তির সার্থক রূপায়নে ঘটেছে পদাবলী সাহিত্যে। ব্যক্তি প্রাণের স্পর্শে উজ্জীবিত এবং গীতি ধর্মই বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করেছে।চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের উপাসনার মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ ধর্মীয় দর্শন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁরই অনিবার্য ফলস্বরূপ উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য বৈষ্ণব পদ। চৈতন্যদেবের দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও তত্ত্ব প্রচারের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় রাধা কৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে বহু

পদ রচিত হয়েছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারের এগুলি চৈতন্যোত্তর পদগুলি থেকে অভিন্ন হওয়াতে রসভোক্তারা উভয় জাতীয় পদ থেকেই রস গ্রহণ করে থাকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্মত রসশাস্ত্র বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসকে শুধু স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও সাহিত্য দর্শনে রসের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। বৈষ্ণবীয় পঞ্চরস বলতে বোঝায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং উজ্জ্বল বা মধুর রস। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রী রূপ গোস্বামী এই পাঁচটি রসকে স্বীকৃতি দিলেও মনে করেন যে, রস আসলে একটাই- তা হল ভক্তিরস।পঞ্চরসের কোন রস সিক্ত বৈষ্ণব পদ শ্রবন- কীর্তনাদির সাহায্যে বিভাবাদি ভাবের দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমের উদ্বোধন ঘটিয়ে দিতে পারে তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে বৈষ্ণব পদাবলী রস ভিত্তি বৈষ্ণবীয় পঞ্চ রস।

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপগোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটিকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে রসশাস্ত্র বিষয়ক আকর গ্রন্থ রূপে বিবেচিত করা হয়। তিনি পঞ্চরসের নাম উল্লেখ করে শেষ করেননি, তার নানাপ্রকার বিভাগ করেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তারা সেই নির্দেশ মেনে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। তিনি পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রসকে প্রাধান্য দিয়ে তার দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন । বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ। এরপর বিপ্রলম্ভের চার বিভাগ কল্পনা করেছেন। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাস। সম্ভোগ দু প্রকার- মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নায়িকার মনোভাব ও আচরণ অবলম্বনে অষ্টাবিধ অবস্থা কল্পনা করা হয়েছে। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, খন্ডিতা প্রভৃতি। বৈষ্ণব কবিগণ এই সমস্ত বিষয়টি তাদের পদের মধ্যে অঙ্গীভূত করেছেন। চৈতন্য জীবনের বাল্যকালের কিছু বিষয় এবং সম্ভবত তাঁর স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরে কিছু বিষয়ে অবলম্বন করে নানা পদ রচিত হয়েছে এই পথগুলোকে শ্রীকৃষ্ণের ভিক্টোরিয়া শ্রীমতি রাধিকার অনুপস্থিত বলে এতে মধুর রসের অভাব ঘটেছে কিন্তু পঞ্চাশের মধ্যে বাৎসল্য রস ও সখ্যরসের পরিচয়

এই পদগুলিতে বর্তমান রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ভিত্তিতে যে পঞ্চ রসের কথা বলা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে-

ক। শান্ত রস

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব মতে শান্ত রসের উপাসনা সম্ভব নয় ।উপাস্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে তার চরণে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যে শান্ত রস প্রকাশ সম্ভব,গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মতে তা সম্ভব নয়। কারণ তাদের মোক্ষ কামনার বস্তু নয়। 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান'। তবে বিদ্যাপতি আত্মসমর্পণের পদগুলিতে শান্ত রস উপস্থিত। বিদ্যাপতি চৈতন্য পূর্ব যুগের কবি এবং গৌড়ীয় তত্ত্ব দ্বারা শাসিত নন বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

খ। দাস্য রস

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব মতে দাস্যভাবের উপাসনা সম্ভবপর নয়। ঈশ্বরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে দাস মনোভাবের প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের উপাসনায় আগ্রহ বোধ করেনি। তারা গোপীজন বল্লভ রূপে তাকে দেখেছেন এবং লীলাশুক রূপে রাধা কৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাই দাস্যভাবের পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্য সমসাময়িক কবির পদে এবং বিদ্যাপতির আত্মসমর্পণের পদে দাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ। বাৎসল্য রস

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনের লীলা অবলম্বনে রচিত পদগুলি বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ।চৈতন্য পূর্ব যুগের কবিরা এজাতীয় কোন পদ রচনা করেননি। এমনকি চৈতন্য সমকালীন কবিদের বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেননি। মাতা যশোদার সঙ্গে বালকৃষ্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে যে বিচিত্র উপাসনা রীতি প্রকাশিত হয়েছে, সমগ্র বিশ্বের অপর কোন ধর্ম মতে তা সম্ভব নয়। এই বাৎসল্য রসের পদ চৈতন্য সমকালীন ভক্তগণ সম্ভবত গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা দর্শনে উজ্জীবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন ।এ বিষয়ে বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব প্রমূখ কবিরা

অপূর্ব নিদর্শনের পদ রচনা করেছেন। এগুলিতে ঐশ্বর্য রস, মধুর রস নেই। বাঙালির আটপৌরে জীবনের রসাস্বাদন এই পদগুলিতে করা সম্ভব।

ঘ । সখ্য রস

বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠ লীলার পদগুলিতে বিশেষভাবে সখ্য রসের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরে তার সঙ্গীদের সঙ্গে গোচারণে কিংবা গৃহপ্রাঙ্গণে খেলাধুলার মেতে থাকতেন। তখন তাদের আচার-আচরণে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে যে সৌহার্দ্যের বিষয়টি প্রকাশিত হত, সেটি সখ্য রস। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাব অনুপস্থিত। বন্ধুরা তাকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম যৌবনে তার জীবনে যখন শ্রীমতি রাধার আবির্ভাব ঘটল তখন থেকে সখাদের ভূমিকা গৌণ হয়ে যেতে থাকে এবং সখীরা সেই স্থান দখল করে। রাধা কৃষ্ণ লীলায় একটি প্রধান ভূমিকা আছে তাদের। যদিও তারা এই লীলায় অংশগ্রহণ করেনি। বৈষ্ণব কবিরা এই সখীদের মতো এই মঞ্জুরিভাবের উপাসনায় রত ছিলেন । শ্রী রূপ গোস্বামী সখ্য রসকে ভক্তি রসের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাকে পঞ্চরসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ঙ। মধুর রস

বৈষ্ণব পদাবলী মধুর রসের মধুভাণ্ড। পদাবলীর মধুর রসাত্মক পদগুলি বিশ্বমানবের মনে রসাস্বাদন সৃষ্টি করে। মধুর রসের দুটি শাখা রয়েছে। তার বিপ্রলম্ভ শাখায় রয়েছে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ।এখানে নায়িকা অবস্থাভেদে অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা ,খন্ডিতা। যে সকল অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলিতে সেই অবস্থার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। সাধারনত পদকর্তারা আক্ষেপানুরাগ, রুপানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে অবলম্বনে পদ রচনা করে থাকেন। এছাড়া মধুর রসের " সম্ভোগ" নামে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর রয়েছে , সেই জাতীয়ও বহু পদ আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর দানখণ্ড,ভারখণ্ড, রাসলীলার পদে 'মুখ্য সম্ভোগ' এবং ভাবজগতের মিলন কল্পনায় ও ভাবসম্মেলনের পদে গৌণসম্ভোগ কল্পনা করা হয়েছে।

মন্তব্য

৫.৩) অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. বৈষ্ণব পদাবলী রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বৈচিত্র্য আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২. বৈষ্ণব পদাবলীর রসভিত্তি বৈষ্ণবীয় পঞ্চ রস। এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।

প্রশ্ন ৩. বৈষ্ণব অলংকারিকদের মতে রস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটি রসের সম্পর্কে আলোচনা করে পাঠ্য পদগুলি সহকারে তার উদাহরণ দাও।

৫.৪) গ্রন্থপঞ্জি

১. বৈষ্ণব পদাবলী ,উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২ বৈষ্ণব সাহিত্য সমীক্ষা, শ্রীমন্ত কুমার জানা

একক ৬। পদাবলীর পর্যায় বিভাগ

পদ পর্যায় - গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী, গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ - অনুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ - প্রেমবৈচিত্ত্য

৬.১) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী

৬.২) গৌরচন্দ্রিকা

৬.৩) পূর্বরাগ

ক) পূর্বরাগ ও অনুরাগ

খ) পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ

গ) পূর্বরাগের প্রকারভেদ

ঘ) পূর্বরাগের পদকর্তা

১. বিদ্যাপতি

২. চন্ডীদাস

৩. জ্ঞানদাস

৪. গোবিন্দদাস

৬.৪) অভিসার

ক) অভিসারের আধ্যাত্মিকতা

খ) অভিসারের রোমান্টিকতা

গ) অভিসারের বৈচিত্র্য

ঘ) অভিসার পর্যায়ের পদকর্তা

১. বিদ্যাপতি

২. চন্ডীদাস

৩. জ্ঞানদাস

৪. গোবিন্দদাস

৬.৫) আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য

ক) আক্ষেপানুরাগ

খ) প্রেমবৈচিত্ত্য

গ) আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের বিশ্লেষণ

ঘ) আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদকর্তা

১. চন্ডীদাস

২. জ্ঞানদাস

৬.৬) অনুশীলনী

৬.৭) গ্রন্থপঞ্জী

৬.১) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী

চৈতন্য দেবের আবির্ভাব এর পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদ রচনার সূত্রপাত হলেও বস্তুত চৈতন্যদেবের প্রভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল।চৈতন্যদেব তথা গৌরাঙ্গ দেবকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ বলে মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণ যে রাধাভাব অঙ্গীকার করে মর্তলোকে গৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এই বিশ্বাসে ভক্তগণ তার মধ্যে দিয়েই পরমপুরুষের ভজনা করেছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র কর্তা বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী বা আচার্য প্রভুগণ ও তাদের শীর্ষ সম্প্রদায়ের সকলেই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে চৈতন্যদেবের অন্তর জীবনের সন্ধান করেছেন। গৌরাঙ্গ সুন্দর এর মধ্যে রাধা ভাবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছেন। এই চৈতন্যদেবের জীবনপর্ব কিন্তু দুটি খাতে প্রবাহিত। বিষয়টি লক্ষণীয় নিমাই পণ্ডিত তথা গৌরাঙ্গ দেব সন্ন্যাস গ্রহনোত্তর জীবনে শ্রী চৈতন্য দেব রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে পদকর্তাগণ তাঁর পরবর্তী জীবন অপেক্ষা তার পূর্ব জীবনের ও যৌবন সাধনার প্রতি অধিক আকর্ষিত হয়েছিল।এই কারণেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক যাবতীয় পদ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ দেবকে অবলম্বন করে যত পদ রচিত হয়েছিল সবই প্রধানত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। চৈতন্য দেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জগতে তাঁর আবির্ভাবে নবজাগরণ দেখা দিয়েছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে চৈতন্য উত্তর বাংলা সাহিত্যে। চৈতন্য প্রভাবপুষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্যই আমাদের সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে একমাত্র ধারাকে বিশ্ব সাহিত্য জগতে সম্মান প্রদান করেছে।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাব এর পূর্বেই বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা কে অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্য উত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই তাকে কোনোক্রমে উল্লেখযোগ্য বলা চলে না। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা যায় চৈতন্য পূর্ব যুগের যেসকল পদাবলী রচিত হয়েছিল তার সবই রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে। চৈতন্য পূর্ব

যুগের কবিদের কেউই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অর্থাৎ বাৎসল্য রস,সখ্য রসের কোন পদ রচনা করেন নি ।হয়তো চৈতন্যের তথা গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রত্যক্ষদর্শী কবি ভক্তগণ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা দর্শনে উদ্বুদ্ধ হই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই মনে করা হয় চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা অনুসরণই যেন পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠ লীলা, আদিপদ রচনা করেছেন।

এছাড়া চৈতন্যদেব তথা গৌরাঙ্গ কে অবলম্বন করে একটা নতুন সাহিত্য ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের জীবতকালেই এর শুরু এবং তার অন্তর্ধান এর পরেও দীর্ঘকালএই ধারা চলেছিল। চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আছে-

ক) চৈতন্যের রূপ ও মহিমার বর্ণনা।

খ) চৈতন্যের লৌকিক জীবন,সন্ন্যাস ও নামসংকীর্তন এর বর্ণনা।

গ) নদীয়া নগরীতে ভাবের অনুসরণে রচিত পদ।

ঘ) শচীমাতার বিরহ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহের অবলম্বনে রচিত পদ

ঙ) চৈতন্য সহচরগণ এর উদ্দেশ্যে ও সম্বন্ধে রচিত পদ।

চ) ব্রজলীলার অনুসরনে রচিত পদ।

এত ভিন্ন জাতীয় গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচিত হলেও এদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ধারা পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ মূল্য বহন করে থাকে। এদের মধ্যে প্রথমটি, তৃতীয় এবং ষষ্ঠ টি পদাবলী কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা নামে পরিচিত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বৈষ্ণব কবি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। লীলা কীর্তনে যে বিশেষ রস বা বিশেষ পর্যায়ের পালা গান পরিবেশিত হয়,কীর্তন আরম্ভে তাঁর সদৃশ কোন গৌড় লীলা পদের গান অতি অবশ্য বিবেচিত হয় এবং এই জাতীয় পদকেই গৌরচন্দ্রিকা নামে অভিহিত করা হয়। অপর শ্রেণীর রচনাও গৌরাঙ্গ সম্পর্কিত কিন্তু গৌরচন্দ্রিকার মর্যাদা লাভ করেনি। অতএব গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ মানেই গৌরচন্দ্রিকা নয়, এ বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ সমূহের একথা বারবার বলা হয়েছে। এমনকি তার মুখ দিয়েও স্বীকার করানো হয়েছে। 'চৈতন্য ভাগবত' এর রচয়িতা বৃন্দাবন দাস কে বলা হয়েছে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস'।তাঁর গ্রন্থের নাম আদিতে ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল' তারপর 'বৃন্দাবনের মোহান্তরা ভাগবত আখ্যা দিল'। স্পষ্টই বোঝা যায় যে কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চৈতন্য লীলার সাদৃশ্য প্রদর্শনের একটা ইচ্ছা বৈষ্ণব ভক্তদের মনে বর্তমান ছিল ।অতএব তারা অতি সচেতন ভাবেই কৃষ্ণলীলার প্রতিটি পর্যায়ে সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চৈতন্য লীলার পদ রচনা করেছেন। চৈতন্যদেব রাধা প্রভাবিত ছিলেন বলেই অভিসার- মান- বিরহ প্রভৃতি অবস্থা তার ওপর আরোপ করায় কোনো বাধা বা অসুবিধা ছিল না। ফলে গৌরচন্দ্রিকা পদে যাবতীয় বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

চৈতন্য জীবনের অপরাপর ঘটনা অবলম্বনে বহু পদ রচিত হলেও তার সম মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। রাধা কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সাদৃশ্য না দেখিয়েও শুধুমাত্র গৌরাঙ্গ জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে অসংখ্য পদ। গৌরাঙ্গ জননী শচীদেবীর গুরু এবং অবশ্যই চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেন বলে বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন -

"আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগৎ নিস্তারি।।"

গৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষ দর্শক অনেকেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকেই। গৌরাঙ্গ দেবের জন্ম ,বাল্য লীলা,বিবাহ, অভিষেক, কীর্তন প্রভৃতি বিষয়ে এ জাতীয় পদের প্রধান উপাদান।এই প্রকার পদ থেকে চৈতন্য জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। চৈতন্যদেবের ভগবত সত্ত্বায় বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও অতি প্রত্যক্ষতার কারনে চৈতন্যদেব তাদের কাছে সুধু তত্ত্ব

থাকেননি। তাঁকে নিয়ে সে যুগের কবিদের রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এর অভাব নেই। এমনকি অদ্বৈত মহাপ্রভু সন্ন্যাস পথযাত্রী শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তখন কবির আরতি

হেদে রে নদীয়া বাঁশি কার মুখ চাও।

বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।।

যাবতীয় ধর্মবোধকে ম্লান করে দিয়ে তার মানবিক মাহাত্ম্য দৃঢ়ভাবে অবস্থিত। গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ এর মত কবিদের পদগুলিতে বিশেষভাবে শচীমাতার হৃদয়ের কাতরতা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বস্তুত গৌরাঙ্গ বিষয়ক এই জাতীয় পদের মানবিক আবেদনে আধ্যাত্মিকতার উপরে প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের কবিগন চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে বঞ্চিত বলেই সম্ভবত সমসময়ের হৃদয়ের উত্তাপ তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তাই চৈতন্যদেব তাদের নিকট তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত।মানবীয় উল্লাস বেদনা দ্বারা তাঁরা অভিভূত হন নি।পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় যে একটা বাস্তব পটভূমি বর্তমান ছিল, একালের কবিদের কল্পনায় সেই মানবিক ভৌগলিক পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। এই কবিদের তাত্ত্বিক উপলব্ধি বরং শিল্পরূপে আবৃত হওয়াতে কাব্যগুনে একালের পদগুলি অনেক বেশি সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

৬.২) গৌরচন্দ্রিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমের স্বাদ নিতে এবং রাধা রূপে কৃষ্ণ প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য গৌর সুন্দর রূপ ধারণ করে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গদেব এক দেহে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল অবতার। অন্তে কৃষ্ণ বহি গৌর। অতএব গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবে যে বৈষ্ণব পদাবলী সমৃদ্ধি লাভ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাধা কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে 'মহাজন পদাবলী' রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু চৈতন্য দেবের আবির্ভাব তার মধ্যে আরও বৈচিত্র রচনা করে। পরবর্তীকালে তার অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক পদ রচিত হলো। কিন্তু তার চেয়েও বড়

বৈচিত্র চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে রচিত হলো অসংখ্য পদ। এক কথায় বলা যেতে পারে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। গৌরচন্দ্রিকাও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, কিন্তু যেকোনো গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গৌরচন্দ্রিকা নয়। শ্রী চৈতন্যের রূপ মহিমা বর্ণনা, নদীয়া নাগরী ভাবের আশ্রয়ে রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং ব্রজ লীলার অনুসরনে যে সব পদ রচিত হয়েছে একমাত্র সেগুলোকে বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা। এছাড়াও গৌরাঙ্গের লৌকিক জীবন, নাম সংকীর্তন অবলম্বনে রচিত পদ এবং চৈতন্য সহচরদের উদ্দেশ্যে ও সম্বন্ধে রচিত পদগুলো গৌরাঙ্গ বিষয়ক হলেও এদের গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না।

বস্তুত রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে সাজুয্য রেখে বৈষ্ণব কবিগণ যে সকল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন একমাত্র এই পদগুলোকে গৌরচন্দ্রিকা বলা যেতে পারে। লীলা কীর্তনে যে বিশেষ পর্যায়ের পালাগান পরিবেশিত হয় কীর্তন আরম্ভে তাঁর সদৃশ কোন গৌরলীলার পদের গাঙ্কে গৌরচন্দ্রিকা বলে। এটা শুনেই স্রোতারা বুঝতে পারে কৃষ্ণ লীলার কোন পর্যায়ের গান অনুষ্ঠিত হবে। বৈষ্ণব পদাবলীর একজন গবেষক অধ্যাপক বলেছেন "রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের সময় ভুমিকাস্বরূপ এই পদগুলি গীত হয়,তাহাতে শ্রোতা বুঝিতে পারেন বৃন্দাবন লীলার কোণ পর্যায়টি আসরে গীত হইবে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক যে কোন পদকেই গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়না। যে পদটিতে বৃন্দাবন লীলার ভাব ব্যাঞ্জনা রহিয়াছে- তাহাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া ধরা হয়। শুদ্ধ প্রেমপূত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আস্বাদন করিতে করিতে শ্রোতা সাময়িকভাবে কামগন্ধহীন প্রেমলোকে উত্তীর্ণ হন। আরেক শ্রেণীর চৈতন্যজীবনী বিষয়ক পদাবলীতে গৌরাঙ্গের জন্ম ,বাল্য ,যৌবন, কীর্তন, নামপ্রচার, সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলি গৌরচন্দ্রিকার মত ভাবসমৃদ্ধ নহে, তবে ইহাতে চৈতন্য জীবনের বাস্তবতার দিকটি সহজ-সরলভাবে বিধৃত হইয়াছে।"

বৃন্দাবন লীলার সঙ্গে সাজুয্য রাখবার উদ্দেশ্যেই গৌরলীলায় পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর প্রভৃতি রচিত হয়েছে। চৈতন্যদেব শ্রীমতি রাধার ভাবটিকে আত্মস্থ করে কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি

করেছিলেন বলেই ব্রজলীলার সঙ্গে গৌরলীলার এই সাদৃশ্য স্পষ্ট। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় কোন কোন গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবে ভাবিত,আবার কোন কোন পদে তিনি রাধা ভাবে ভাবিত। যেমন দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতিতে শ্রী গৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবে লীলা করেছেন। তাই এইসব গৌরচন্দ্রিকা গৌরচন্দের কৃষ্ণভাব। খন্দিতা,বাসকসজ্জা বা মাথুরে গৌরচন্দের রাধাভাব। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ,ব্রজলীলা, কালিয়দমন গৌরচন্দ্রিকা শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ ভাব। কতগুলি গৌর বিষয়ক পদে যেমন, গোবিন্দদাসের "পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বান্ধে, করুন নয়নে চায়", পরমানন্দ সেনের "পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে, পরশে ছোঁয়াইলে হয় সোনা" ইত্যাদিতে চৈতন্যের যে চিত্র আছে তা আচণ্ডালে প্রেম বিতরণকারী পতিতপাবন গৌরচন্দ্রের। এই ধরনের পদগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। এ ক্ষেত্রেই গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা।

কৃষ্ণলীলা কীর্তনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা অবতারণার একটি তাৎপর্য আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল তৈরি হয় এবং একই সঙ্গে শ্রোতার মনও উপযুক্ত রসগ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন " মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলায় চমৎকারিত্ব যেভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন এমন আর কেহ করেন নাই। বস্তুত সেই নিখিল রসমাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে নিজ রসমাধুর্য নিজেই আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারই অনুগত হইয়া রসাস্বাদন করিবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া সর্বদা যোগ্য বলিয়া মনে হয়।" গৌরচন্দ্রিকা নামকরন থেকে সহজে একটি সত্যকে চিনে নেওয়া যায়। গৌরাঙ্গদেব পরবর্তী জীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্যদেব রূপে পরিচিত ছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র চৈতন্যদেবকে অবলম্বন গড়ে উঠেছে। তার জীবনী গ্রন্থগুলো চৈতন্য নামাঙ্কিত কিন্তু তা সত্বেও যে গৌরচন্দ্রিকা চৈতন্যচন্দ্রিকা হলো না, তার একমাত্র কারণ এই যে গৌরলীলার কাহিনী প্রধানত তাঁর সন্ন্যাস পূর্ব জীবন অর্থাৎ গৌরাঙ্গ জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। মনে রাখা দরকার কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়নি। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরাঙ্গদেব প্রথম

জীবনে রাধা ভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণপ্রেম কামনা করেছিলেন এবং এই সময়ে তার মধ্যে রাধা ভাবের অনুরূপ পূর্বরাগ অভিসার প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। চৈতন্য সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে অনেক কবি গৌরাঙ্গদেবকে অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে তাদের সকল পদ গৌরচন্দ্রিকা নয়। গৌরাঙ্গের রূপ ও মহিমাসূচক পদগুলো গৌরচন্দ্রিকার অন্তর্ভুক্ত।

যেমন গোবিন্দ দাসের

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে

পুলক মুকুল অবলম্বনে ।

গৌরাঙ্গের সমকালীন ঘোষভাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ হাত দিয়ে সম্ভবত গৌরচন্দ্রিকার বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত পদ রচিত হয়েছিল। তাই বাসুদেব ঘোষ আবার নিমাই সন্ন্যাস এর পালা লিখে চৈতন্য জীবনের অনেক প্রামাণ্য কাহিনী উদঘাটন করেছেন। তিনি প্রথম রাধাকৃষ্ণলীলার অনুসরণে চৈতন্যদেবের পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ কবিতা রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মত গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার পদ লিখেছেন বাসুদেব ঘোষ-

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিস্বাম্ভর রায়।

হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।

বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।

শচী বলে বিস্বাম্ভর বলেনি আমি না দেখিনু।।

আরো অনেকেই বৃন্দাবনলীলার অনুসরণে বিভিন্ন পর্যায়ের গৌরচন্দ্রিকা রচনা করেছেন। রাধামোহন বয়ঃসন্ধি, অভিসার, রসোদ্গার, খণ্ডিতা, কলহন্তরিতা, রুপোল্লাস, গোষ্ঠ ,রাস, বিরহ -যাবতীয় পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন ।এছাড়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তারা গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন এর অনুসরণে গৌরচন্দ্রিকার পদগুলো রচিত হয়েছিল বলে এর মধ্যেও অসাধারণ বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।পদকর্তারা চৈতন্যদেব ও রাধার আবেগের সাদৃশ্য অনুভব করে রাধার অনুভূতিই গৌরাঙ্গদেবের ওপর আরোপ করেছেন। গৌরচন্দ্রিকার বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে।

রাধামোহন রচিত পূর্বরাগের একটি পদ-

আজু হাম পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থও।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।।

এখানে বলা হয়েছে আমি আজ নবদ্বীপচন্দ্র কে কি রূপে দেখলাম? তিনি করতলে বদন ন্যস্ত করে বসে আছেন। তিনি বারবার ঘর-বার করছেন। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে একান্ত গিয়ে বসে থাকছেন। তার সুবিশাল নয়নযুগল ছল ছল করছে। তাতে নব নব ভাব প্রকাশিত হচ্ছে । পুলকজাত রোমাঞ্চ রূপ মুকুলে তার সর্ব দেহ শিহরিত হচ্ছে।

রাধামোহন ভেবেচিন্তে এর থই পেলেন না।

এখানে গৌরাঙ্গ দেবের দেহ ও মনোভাব বর্ণিত হলেও এটি শ্রীমতি রাধিকার পূর্বরাগের ভাব যা গৌরাঙ্গ দেহে সঞ্চারিত হয়েছে। একবার কৃষ্ণদর্শন পাওয়ার পর রাধার মনে পূর্ণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তার ফলে তার মনে যে কখনো বিরহ, কখনো অস্থিরতা আবার কখনো ঔদাসীন্য সৃষ্টি হয়। সেই ভাবই কবি এখানে গৌরাঙ্গ দেহে আরোপ করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গৌরাঙ্গ দেবকে সর্বদাই রাধাভাবে কল্পনা করতেন বলে প্রত্যেকটি গৌরচন্দ্রিকা পদে রাধা কৃষ্ণ লীলার কোন একটা ভাব আরপিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ গালে হাত দিয়ে বসে আছে- এতে বিরহের ভাব কল্পিত হয়েছে। ঘর বার হওয়ার মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশিত। ফুলবনে বসে থাকার মধ্যে ঔদাসীন্যের ভাব রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে পূর্বরাগের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এইপ্রসঙ্গে চন্ডীদাসের পূর্বরাগের একটি পদে তুলনা চলে।

ঘরের বাইরে দন্ডে শতবার

তিলে তিলে আইসে যায়।

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন

কদম্ব কাননে চায়।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ব্রজবুলি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে

পুলক মুকুল অবলম্ব।

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত

বিকশিত ভাব কদম্।।

কি পেখলুঁ নতবর গৌর কিশোর।

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চুরু

সুরধ্বনি তীরে উজোর ।।

চঞ্চল চরণ কমল তলে ঝঙ্করু

ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

পরিমলে লুব্ধ সুরাসুর ধাবই

অহর্নিশি রহত অগোর।।

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে

অখিল মনরথ পুর।

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত

গোবিন্দদাস রহুঁ দূর।।

এখানে বলা হয়েছে ঘনঘন বারি সিঞ্চনে বৃক্ষ দেহ যেমন মুকুলিত হয়, তেমনি মেঘ সদৃশ নয়ন থেকে উদগত অশ্রু নিষেকে গৌরঙ্গ দেহপুলকাদি অস্ত সাত্ত্বিক ভাব রোমাঞ্চ দেখা

দিয়েছে। তার দেহের ঘর্মজল মধুর মত বিন্দু বিন্দু খরিত হচ্ছে, আর তার থেকে কদম্বের মত ভাবরাজি বিকশিত হচ্ছে।আহা!নতবর গৌর কিশরকে একি দেখলাম! ভাগিরতির তীর উজ্জ্বল করে যেন এক অপূর্ব স্বর্ণময় কল্পবৃক্ষ সঞ্চরণ করছে। আর ভ্রমরের মত বিভোর ভক্তরা তাঁর চঞ্চল চরণকমলতলে গুঞ্জন ধ্বনি তুলে চলছে। পরিমলের লোভে সুর এবং অসুর সেখানে ছুটে আসছে এবং মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে। গৌরাঙ্গ প্রেমরত্নরূপ ফল বিতরণ করে অখিল ব্রহ্মান্ডের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন।তাঁর চরণ থেকে বঞ্চিত গোবিন্দদাস দূরেই রইলেন।

গৌরাঙ্গ দেব যখন ভক্তদের মধ্যে কৃপা বিতরণ করছেন তখন তার মধ্যে কৃষ্ণভাব সঞ্চারিত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেম আস্বাদনের নিমিত্তেই গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আলোচ্য পদে সেই গৌরাঙ্গের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রকাশ ঘটেছে। ফলে পদটি বৈষ্ণব তত্ত্বের দিক থেকে সার্থক। গৌরাঙ্গ দেবের দৈহিক সৌন্দর্য এবং আন্তরিক মাধুর্যের জন্য কবি তাকে কল্পতরু রূপে কল্পনা করেছেন। তার দেহে অন্তরের সৌন্দর্য ও মাধুর্য পরিচয় পাওয়া যায়। কল্পনার মধ্যে একদিকে যেমন গৌরকিশোরের প্রকৃত রূপ ধরা পড়েছে, তেমনি সহস্রধারায় উচ্চসিত করুনার যথার্থ পরিচয় ও বৈষ্ণব তত্ত্ব পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

৬.৩) পূর্বরাগ

বৈষ্ণব পদাবলী প্রধানত মধুর রস বা শৃঙ্গার রসের কাব্য। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রী রূপ গোস্বামী শৃঙ্গার রসের দুটি ভাগ কল্পনা করেছেন। তার একটি বিপ্রলম্ভ ও অপরটি সম্ভোগ। সাধারণভাবে আমরা জানি প্রিয় বা প্রিয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ, যাকে ভালো লাগে, যার কথা শুনলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয় ,যার সঙ্গে পুনর্বার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাকেই পূর্বরাগ বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে পূর্বরাগের পদগুলি রচিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু সেইরকমই। বৈষ্ণব তত্ত্বের অন্যতম গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি' তে পূর্বরাগ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।সেখানে

পূর্বরাগ বিষয়টি একান্ত ভাবে রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে বলে তাকে সাধারণ পূর্বরাগ বলে মনে করা যায় না। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে-

রতিযা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা ।

তয়োরুন্মিলিত প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগঃ স উচ্চতে।।

অর্থাৎ যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শনের ও শ্রবণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে তার নামই পূর্বরাগ। যদিও মাধবের রাগ প্রথম সম্পন্ন হয় তথাপি মৃগাক্ষীগণের প্রথম রাগেই চারুতা বিকশিত হয়ে থাকে।' উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রদত্ত সূত্র অনুসারে আমরা পাচ্ছি মিলনের পূর্বে দর্শন হেতু নায়ক বা নায়িকার মনে অপরের বিষয়ে যে রতি বা অনুরাগ সৃষ্টি হয় তাকে বলে পূর্বরাগ ।বৃন্দাবন লীলায় অনুরাগ প্রথম দেখা দিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের মনে। কিন্তু চারুতার আধিক্য শ্রীমতি রাধিকার অনুরাগেই। কথায় বলা চলে পূর্বরাগের পদ যেমন কৃষ্ণ বিষয়ক হতে পারে, তেমন রাধা বিষয়ক হতে পারে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে রাধার পূর্বরাগ বেশি উপভোগ্য। এখানে রতি অর্থাৎ অনুরাগ কথাটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

ক) পূর্বরাগ ও অনুরাগ

পূর্বরূপ এবং অনুরাগ বৈষ্ণব পদাবলীতে এই দুটি পৃথক বিষয় রূপে বর্ণিত হলেও আংশিক সাদৃশ্যের জন্য অনেক সময় এই দুটিকে এক গুচ্ছে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এ দুটির পার্থক্য বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। নায়ক বা নায়িকার প্রথম দর্শনে প্রাথমিক আকর্ষণবোধ, সেই অবস্থার নাম পূর্বরাগ। পূর্বরাগ বস্তুত প্রেমের প্রথম পর্যায়। সেই মুগ্ধতা যখন গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় তখন তাকে অনুরাগ বলা চলে। উভয়ের মধ্যে সাধারণভাবে পার্থক্য করতে গিয়ে খুব সহজে বোঝানো যায় যে, প্রথম দর্শনের পর এবং মিলনের পূর্ব পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় যে পদে,তারই পারিভাষিক নাম পূর্বরাগ। এই বিষয়টি 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিকে পূর্বরাগের প্রধান লক্ষণ রূপে গ্রহণ করতে হয়।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে 'অনুরাগ' সম্পর্কে বলা হয়েছে - যতবার প্রিয় কে দেখে, ততবার যেন মনে হয় নতুন। যতবার অনুভব করে, ততবারই মনে জাগে অনাস্বাদিত এক অনুভূতি ।এই অবস্থার নাম অনুরাগ।নায়কের মাধুর্য বা মধুরিমা মুহুর্মুহু অনুভূত হলেও সেই মধুরিমাকে আবার অনুভূত করার অতিশয় তৃষ্ণাকে অনুরাগ বলে।

কবি নন্দকিশোর দাস 'রসকলিকা' গ্রন্থে ভিন্নভাবে 'পূর্বরাগ' ও 'অনুরাগ' এর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ।
সঙ্গ পড়ে রাগ যেই সেই অনুরাগ।।

এই সংজ্ঞাকে মেনে নিলে কোন পূর্বরাগের পদকে অনুরাগ বলে অভিহিত করা চলে না।কারণ পূর্বরাগ মিলনের পূর্বে জাত, পক্ষান্তরে অনুরাগের সৃষ্টি হয় মিলনের পরে। সেই হিসেবে মিলন এবং রসোদগারের পদগুলিকে অনুরাগের পদ বলে দেখা করা যেতে পারে।

নন্দকিশোর অন্যত্র 'অনুরাগ' এর বিষয়ে বলেছেন -

অনুরাগের লক্ষণ হয় চারি প্রকার।
উল্লাস, আক্ষেপ,রূপ, অভিসার আর।।

অর্থাৎ তার মতে অনুরাগ চার প্রকার উল্লাসানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ এবং অভিসানুরাগ। নন্দকিশোর এই হিসেবে 'উল্লাসানুরাগ'কে অতিরিক্ত হিসেবে যোগ করলেন। কারণ 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে ত্রিবিধ অনুরাগ এর কথা বলা হয়েছে -

'অনুরাগো ভবেৎ ত্রিধা রুপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ।
অভিসারানুরাগশ্চ জ্ঞায়স্তে রসিকৈজ নৈঃ।।'

বৈষ্ণব কবিরা তিন জাতীয় অনুরাগের মধ্যে একমাত্র রুপানুরাগকেই অনেকাংশে পূর্বরাগের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। যদিও যথার্থ বিচারে এটিকে রসোদগারের সমধর্মী রূপে গ্রহণ করা সংগত। আক্ষেপানুরাগকে অনেকেই প্রেম বৈচিত্রের সঙ্গে একীভূত করে থাকেন।

খ) পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ

প্রথমে পূর্বরাগ রূপানুরাগ এর সম্পর্ক কি বিচার করা নেয়া প্রয়োজন । যথার্থ অর্থে পূর্বরাগ মিলনের পূর্ববর্তী ও অনুরাগ মিলনের পরবর্তী পর্যায়।সেই অনুসারে রূপানুরাগ ও মিলনের পরবর্তী রসোদগার পর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সম্ভবত বৈষ্ণব কবি এবং লেখক পাঠকগণ রূপানুরাগকে সেইভাবে বিচার করেন না। তাদের দৃষ্টিতে রাধা বা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের বিষয়টি বিবেচ্য হয় তা মিলনের পূর্বে বা পরে ঘটেছিল। সেই তত্ত্বে তাদের কোন রুচি নেই। এখানেও রূপানুরাগ বলতে সাধারণভাবে রূপের প্রতি অনুরাগের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রূপ গোস্বামী তার 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে অনুরাগ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ করলেও পূর্বরাগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি পূর্বরাগকে দুটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। দর্শনজাত পূর্বরাগ এবং শ্রবণজাত পূর্বরাগ। কবি কর্ণপুর দর্শনজাত পূর্বরাগের তিনটি ভাগ করেছেন - সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্র পট দর্শন এবং স্বপ্নদর্শন। এবং শ্রবনজাত পূর্বরাগকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন - বন্দি মুখে শ্রবণ, দ্যুতি মুখে শ্রবণ, গুণীজনের নিকট শ্রবণ, সখি মুখে শ্রবণ এবং বংশী ধ্বনি শ্রবন। পদাবলীতে রাধার পূর্বরাগ সম্ভবত মহাজনপদকর্তাদের একটি প্রিয় বিষয়। তাঁরা এই পূর্বরাগের মূলে রূপানুরাগ এর ভূমিকাকে সর্বাধিক অবলম্বন করেছেন। রাধার রূপানুরাগ অবলম্বনে বহু পদকর্তা বহু পদ রচনা করেছেন। জ্ঞানদাস বিভিন্ন রূপানুরাগ এর পদ রচনা করেছেন। যেমন-

আলো মুঞি কেন গেলু যমুনার জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিলো।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ।।
ঘরে যাইতে পথ মর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ।।

রূপানুরাগের পদে এরকম সাক্ষাৎ দর্শনে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে শ্যামের চিত্রপট দেখার জন্যও রাধা চিত্ত ব্যাকুল হয়। চন্ডীদাসের একটি পদে আছে-

হামসে অবলা হৃদয় অখলা

ভালমন্দ নাহি জানি

বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া

বিশাখা দেখাল আনি।।

রামানন্দ বসুর একটি পদে স্বপ্নদর্শন জাত রূপানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়-

তোমারে কহিয়ে সখী স্বপ্ন কাহিনী।

পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি।।

শ্রবণানুরাগের চণ্ডীদাসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা –

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গিয়া

আকুল করিল মোর প্রাণ ।।

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রী রাধার পূর্বরাগ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। জ্ঞান্দাসের পূর্বরাগের একটি জনপ্রিয় পদ-

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মন কান্দে।

পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

পদটির কয়েকটি পংক্তি অবলম্বন করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন," উদ্ধৃতির অনুরুপ রক্তের অণু-পরমাণুর এত বড় গীতক্রন্দন বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই। অনন্ত বাসনার অনন্ত হাহাকার মাত্র চার ছাত্রের মধ্যে যেভাবে ধরা পড়িয়াছে, তেমন মহাবিস্ময় কাব্যেতিহাসে অল্পই ঘটিয়াছে।" নিখিলের বেদনা কোন এক ক্ষুদ্র মানবকণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া সম্ভব এ

কথা বিশ্বাস করা যায় এই কটি পংক্তি পড়েই। রুপানুরাগের তীব্রতাকে স্পর্শ করেছে জ্ঞানদাসের এই পদ।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে যে নায়কের মনে প্রথম পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়।নায়িকার পূর্বরাগের চারুতার আধিক্যের জন্য কবিদের পক্ষপাতিত্ব শ্রীমতি রাধিকার পূর্বরাগের পদ রচনাতেই। তবুও শ্রী রাধার পূর্বরাগ এর মত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ এর পদ আছে। রাধার প্রত্যক্ষ দর্শন জাত এই পূর্বরাগ। বিদ্যাপতি এ রকম পদ রচনা করেছেন-

জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহার ভেলি।
নবজলধরবিজুলি রেহা
দন্দ পসারি গেলি।।

বিদ্যাপতি রচিত এই ধরনের আরও অনেক পদে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এরূপ চণ্ডীদাসের কিছু কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ রয়েছে-

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি
চমকে চলিয়া গেল।

গ) পূর্বরাগের প্রকারভেদ

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পূর্বরাগের অনেক সূক্ষ্ম ভাব লক্ষন বর্ণনা করা হয়েছে ।পূর্বরাগের রতি বিষয়ে যে সকল সঞ্চারি ভাবের উদয় হয়, তার মধ্যে অধিকাংশ ব্যাধি,শঙ্কা,অসূয়া,শ্রম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, মোহ,মৃত্যু প্রভৃতি রয়েছে। এই রতি প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ ত্রিবিধ ।

সমর্থ রতির যে স্বরূপ তাকে বলা হয় 'প্রৌঢ়'। প্রৌঢ় পূর্বরাগে- লালসা, উদ্বেগ, ব্যাধি,জড়তা,উন্মাদ,মোহ, মৃত্যু প্রভৃতি দশ দশা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব কবিদের বিভিন্ন পদে সমস্ত লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায়। সামঞ্জসা রতির স্বরূপকে বলা হয় 'সমঞ্জস'। এতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, ব্যাধি, জড়তা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বৈষ্ণব

কবিদের পদে এদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাধারণপ্রায় রতিকে 'সাধারণ' বলা হয়। ষোলটি কোমল ভাব এর অন্তর্ভুক্ত।

রসশাস্ত্রে নায়িকা ভেদে পূর্বরাগের প্রকারভেদের কথা বলা হয়েছে। যথা- মুগ্ধা, মধ্যমা ও প্রগলভা। যার রূপে নায়িকা মুগ্ধ, তার দৃষ্টি আকর্ষণ কে বলা হয় 'অভিযোগ'। অভিযোগ পূর্বরাগের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ ভেদে এই অভিযোগ তিন প্রকার। পদাবলীতে তিন জাতীয় অভিযোগের নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি অভিযোগের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে-

'থির বিজুরি বরণ গোরি পেখলুঁ ঘাটের কুলে।'

ঘ) পূর্বরাগের পদকর্তা

বৈষ্ণব পদকর্তাদের নিকট পূর্বরাগ একটি অতি জনপ্রিয় বিষয়। অধিকাংশ কবিই পূর্বরাগ বিষয়ে কোন না কোন পদ রচনা করেছেন। তবে কবিদের এবং তাদের রচিত পদের সংখ্যা এত বেশি হওয়ায় নির্বাচিত পদ ও কয়েকজন পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি রূপমুগ্ধতার কবি তাই রুপানুরাগের কবিতায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য পর্যায়ে বিদ্যাপতির পদ রচনায় যত সুখ্যাতি অর্জন করেছেন পূর্বরাগের তার প্রাপ্তি তত বেশি নয়। তবে এই রূপমুগ্ধতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন পূর্বরাগের পদে যখন রাধার বয়সন্ধি পর্যায়।

মাধব পে খল অপরুপ বালা।

সৈসৈব জৌবন দুহু এক ভেলা।।

অপরূপ বালক মাধবকে দেখার পর থেকেই রাধার শৈশব যৌবন এক হয়ে গেল। বয়সন্ধি পর্যায়ে বিদ্যাপতি পূর্বরাগের পূর্বাভাস রচনা করেছেন। পূর্বরাগে রাধার বয়সের নবীনতা না বুঝলেও লীলা চাতুর্যের প্রকাশ ঘটেছে।রাধা স্নান সেরে ফিরছে কিন্তু পেছনে না তাকিয়ে যদি সত্যি ফিরে যান তবে তার কৃষ্ণ দর্শন হবে না। তাই-

তঁহি পুন মোতি হার তোড়ি কেকল

কহত হার্ টুটি গেল।

সব জন এক এক চুনি সঞ্চুরু

শ্যামদরশ ধনি লেল।।

এ জাতীয় পদে রাধার চঞ্চলতা এবং চাতুর্য দুটিরই প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণ দর্শন পিপাসা যে তার মনে বর্তমান ছিল, সেই বুঝেই এই ছলনা। আবার অন্য পদে রাধার মানস বিবর্তনের চিত্রটিও বিদ্যাপতি অপূর্ব রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন -

অবনত আনন্ কএ হম রহলিহু,

বারল লোচন চোর।

পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল

জনু সে চাঁদ চকোর।।

পূর্বরাগে রাধার কাছে কৃষ্ণই সর্বস্ব। রাধা-কৃষ্ণকে ' জীবক জীবন হাম ঐছে জানি'।কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।'গেলি কামিনী গজহু গামিনি'অথবা 'জব গোধূলি সময় বেলি' বা ' আজু মঝু শুভদিন ভেলা' প্রভৃতি পদে মুগ্ধ কৃষ্ণ প্রাণের উচ্চসিত কথা বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদ রচনাকে উজ্জ্বল করেছে ।তিনি ভাব ছেড়ে রূপ এবং রস ছেড়ে অর্থের দিকেই বেশি প্রবণতা দেখিয়েছেন। আমরা সাধারনত পূর্বরাগ বলতে শ্রী রাধার পূর্বরাগ কে বুঝে থাকি এবং এই জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যাপতি রচিত পদকে মর্যাদা দান করি।

২. চন্ডীদাস

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিচারে চন্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা করার পক্ষে একটা প্রাথমিক অসুবিধে হল, চন্ডীদাসের বহু পদেই বিভিন্ন রসের মিশ্রন ঘটেছে।অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ রূপ পাওয়া যায় না। মনে হয় ,ব্যক্তিগতভাবে চন্ডীদাস তাঁর বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন বলে বহির্জগতের বিষয়ে তার পক্ষে পূর্ণ সচেতন থাকা সম্ভব হতো না। এই কারণে পূর্বরাগের মধ্যেও তাঁর ক্ষেত্রে বিরহের ছায়াপাত ঘটেছে। পূর্বরাগে

যে উল্লাস দেখা যায় চন্ডীদাসের পদে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। একটা স্বাভাবিক ব্যাখা এমন হতে পারে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব রচিত হবার আগে হয়তো চন্ডীদাস পদগুলি রচনা করেছিলেন। তাই বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁর পদ বিন্যাস করতে গেলে বিপর্যয় দেখা যায়।

চৈতন্য জীবনীকারগণ স্বীকার করেছেন যে চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ এর সঙ্গে চন্ডীদাসের পদ এরও রসাস্বাদন করতেন। তাহলে পদকর্তা চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন। চৈতন্য সমকাল বা চৈতন্য উত্তর সময়ে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রচলন করেছেন ,চন্ডীদাস নিশ্চয়ই তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাই চণ্ডীদাসের কাব্যে এ জাতীয় রসবিপর্যয় কে চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এর থেকে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রসিদ্ধ এক পদ ' রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা'।এই রাধার সঙ্গে অনেকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাব ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছেন। চন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনীর বেশে-

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসয়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি।।

চন্ডীদাসের পূর্বরাগের মধ্যে যে উদাসীনতার নির্দেশ আছে, চন্ডীদাসের রাধা চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। 'শ্যাম নাম' শুনেই সে আকুল হয়ে পড়ে। সে যে কৃষ্ণকেশ আর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখে কৃষ্ণ স্মরণে আত্মবিস্মৃত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কৃষ্ণ সমর্পিত প্রানা রাধিকাকে প্রায় বারবার এভাবেই লক্ষ্য করা যায় চন্ডীদাসের যাবতীয় পদে।

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো

অঙ্গের পরশে কিবা হয়।।'

এটিকে শুধু চন্ডীদাসের নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি অপূর্ব কীর্তি বলে মনে করা হয়।বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুযায়ী এটি শ্রবণ জাত পূর্বরাগের পদ। শ্রীমতি এখনো কৃষ্ণ দর্শন পাননি শুধু নাম শুনেছেন এবং তাতেই শুধু যে তার মনে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়েছে তা নয়, নামটি তার দেহ-মনকে আকুল করে তুলেছে। এই অনুভূতি শুধু সহৃদয় সংবেদনের নয়, এর সার্বজনীনতা দেশকাল, ব্যক্তির সীমা লংঘন করে যায়। যে কৃষ্ণ তন্ময়তার কথা বলা হয় এখানেও সেটি দেখা যাচ্ছে। 'অঙ্গের পরশে কিবা হয়' এই উক্তির মধ্যে দিয়ে যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে রাধার দেহ সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে ,কিন্তু এটি তাঁর ভীতির ফলে হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ নাম জপ করতে করতেই যার অঙ্গ অবশ হয়ে যায় তার পক্ষে এ জাতীয় দেহ সচেতনতার অভাব মনে আসা সম্ভব নয়। পূর্বরাগে চন্ডীদাসের কৃতিত্ব বিষয়ে মনে করা যেতে পারে ভক্ত-সমালোচক দীনেশ চন্দ্র সেনের অভিমত। তিনি বলেছেন চন্ডীদাসের বাণী সহজ-সরল সুন্দর।" পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ন রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্যপ্রভুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

৩. জ্ঞানদাস

পূর্বরাগের পদ রচনায় জ্ঞানদাস যথার্থই চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য। রাধার দৃষ্টিতে তিনি যখন কৃষ্ণ দর্শন করেন তখন তিনি রাধার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন ।কবি কৃষ্ণ রূপের বর্ণনার চেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাধার মনোভাব প্রকাশে। জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন । তিনি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন, তাও রাধার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। কৃষ্ণকে দেখে রাধার মনে যে ভাব জেগেছে তার রূপের পরিচয় দিয়েছেন জ্ঞানদাস-

তুমি কি জান সই কাহ্নুর পিরীতি

তোমারে বলিব কি।

সব পরিহরি এ নাতি জীবন

তাহারে সঁপিয়াছি।।

প্রাণ সই কৈ আর কুল বিচারে।

প্রাণ বন্ধুয়া বিনে তিলেক না জীউ

কি মোর সোদর পরে।।

পূর্বরাগ ও রূপানুরাগের কোন কোন পদে জ্ঞানদাস কবিত্বের দিক থেকে যেন নিজেকেই নিজে অতিক্রম করে গেছেন। কৃষ্ণ দর্শন লাভ করার পর রাধিকা আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। তাই সখেদে তিনি বলেন-

আলো মুঞি জানো না

জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।

চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।।

এরপরই রাধিকা কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।

কৃষ্ণ দর্শনে উচ্ছ্বসিত রাধার উক্তিতে অলংকার বাহুল্য নেই। সহজ-সরল কথায় তিনি মনের ভাব প্রকাশ করেছেন । কিন্তু সেই কথাই পাঠককে উদ্বেল করে-

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।

এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।।

এই একটিমাত্র কথাতেই রাধার রূপ মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন ব্রজবুলি ভাষায় ।কিন্তু এ ধরনের পদগুলিতে তিনি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের, মত স্বার্থকতা অর্জন করতে পারেননি।

৪. গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসকে বলা হয় বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ।অতএব কবিধর্মের মধ্যে দুজনের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন বিদ্যাপতি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ।গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সৃষ্টির পূর্বেই বিদ্যাপতি তার কাব্য রচনা করে গেছেন। পক্ষান্তরে গোবিন্দদাস শুধু চৈতন্য উত্তর যুগের কবি নন ,তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তাই বিদ্যাপতির কাব্যে যেখানে শুধুই চিত্রময়তা, গোবিন্দদাসের কাব্যে সেখানে তার সঙ্গে ভাব ব্যাকুলতার সংযুক্তিকরণ ঘটেছে। গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের পদগুলিতে যে শিল্প চাতুর্য ও আন্তরিকতা দেখা যায় তা অতুলনীয়। কবি তার উপাস্য দেবতা কে অন্তরে ঠাঁই দিয়েছেন এবং তাতে আত্মলীন হয়েছেন, কিন্তু আত্মহারা হননি। গোবিন্দদাস ধীর এবং প্রশান্ত।

গোবিন্দদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই তার ওপর গৌরাঙ্গ দেবের প্রভাবের পরিমাণ যথেষ্ট। রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ অনুসরণে তিনি গৌরাঙ্গ দেবের পূর্বরাগ সূচক যেসকল গৌরচন্দ্রিকা রচনা করেছেন তার কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় একটি পদে কবি শ্রবনানুরাগ ও দর্শনানুরাগের পরিচয় দিয়েছেন-

পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কৈল
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশালি
নবজলধর জিনি কাঁতি
চকিত হইয়া হাম যাঁহা ধাইয়ে

তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি।।

রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা অপেক্ষা গোবিন্দদাস গুরু বিদ্যাপতির মতোই কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । গোবিন্দদাসের-

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি

তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হতি ।।

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।

তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি।।

পদটিতে যে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে বাচনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়াতে একটি সাধারণ পরিচিত উপমা উৎপ্রেক্ষার বস্তুও অসাধারণ অভিনবত্ব লাভ করে রস ও সৌন্দর্যের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চিত্র সৃষ্টিতে গোবিন্দদাসের সার্থকতা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায়। তিনি অপর সকল বৈষ্ণব কবিকে অতিক্রম করে গেছেন। শব্দের ঝংকার, অলংকার বাহুল্য এবং চিত্রকল্পের ব্যবহারে তিনি এক অপূর্ব রূপজগত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোন কোন রুপানুরাগের পদে এরপরে তিনি রূপ জগতকে অতিক্রম করে ভাব জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৬.৪) অভিসার

নায়ক বা নায়িকার প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেত স্থানে গমনকে অভিসার বলা হয়। বৈষ্ণবীয় পঞ্চ রসের মধ্যে অভিসারের স্থান নেই। রসশাস্ত্র যে পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত নায়িকার প্রত্যেকেই অষ্ট অবস্থার অধীনে হতে পারে। এই অবস্থার প্রথমটি অভিসারিকা। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে অভিসারিকার লক্ষণ হিসেবে বলেছেন-

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসারত্যপি।

সা জ্যোৎস্নী তামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।

লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।

কৃতাবগুনঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেত।।

অর্থাৎ যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা নিজে অভিসার করেন তাকেই বলে অভিসারিকা। জ্যোৎস্না ও তাপসী ভেদে তিনি দ্বিবিধা ।এই নায়িকা কান্তের কাছে গমনকালে লজ্জায় যেন রঙিন হয়ে থাকেন । তার কঙ্কন কিঙ্কিণী, নুপুরের শব্দ থাকে নিঃশব্দ। অবগুন্ঠিত হয়ে ইনি স্নেহ পরায়ণা একটিমাত্র সখীকে নিয়ে অভিসার করেন। ' উজ্জ্বলনীলমণি'তে দ্বিবিধ অভিসারের কথা বলা হলেও পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জুরী' তে এবং অন্যত্র ছয় প্রকার অভিসারের কথা বলা হয়।বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার ও সঞ্চরাভিসার। এর মধ্যে সম্ভবত বর্ষাভিসার কবিদের সর্বাধিক প্রিয়। রসশাস্ত্রে নায়িকার অষ্টাবস্থা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা অভিসারের ব্যাপারে নারীকে শুধু স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। অভিসারিকার পুংলিঙ্গে অভিসারক শব্দের প্রচলন থেকেই পুরুষের অভিসার অনভিপ্রেত তা অনুমান করা যায়। কিন্তু 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে মাঝেমধ্যে কৃষ্ণের অভিসারের পদ দেখা যায়। যদিও তা অতটা প্রসিদ্ধ নয় ।প্রসঙ্গক্রমে ইউরোপীয় সাহিত্যের serenade এর কথা উল্লেখ করা যায়। সেটি পুরুষ অভিসার। বাস্তব জগতে পুরুষের অভিসার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কথা নয়।

ক) অভিসারের আধ্যাত্মিকতা

বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ অভিসারের বিষয়কে অবলম্বন করে নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অভিসারের সহজ আর্থিক ব্যাখ্যা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, তিনি পরমাত্মা। তিনি সর্বদাই জীবাত্মাকে তার দিকে আকর্ষণ করছে ।কৃষ্ণ কথাটির মধ্যে আকর্ষণের ধর্ম বজায় রয়েছে। রাধিকা অর্থ আরাধিকা, জীবাত্মার প্রতীক ।তার অভিসার কৃষ্ণের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি। শ্রীমদভাগবত এর শব্দ 'অয়নারাধিত' থেকে রাধা শব্দের উৎপত্তি। এখানেই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের জীবাত্মা পরমাত্মা সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। অভিসারের সঙ্গে মানব জীবনের একটি গভীর যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায় ।আমরা আমাদের ব্যক্তিজীবনে

আধ্যাত্বিক চিত্ত পাই অভিসার বা অভিসরনের মধ্যে দিয়ে। রাধার অভিসার এবং জীবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ সাধারণ মানুষের কোন নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার তাড়ণায় কেবলই এগিয়ে চলার মধ্যে একটা সংগতি বর্তমান রয়েছে। ব্যাকুল প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে সুদূর কে কাছে পাওয়ার বা অসীম রহস্য লোকের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করার তীব্র গতিবেগ যেন এক প্রকার অভিসার। যেকোনো একটি অভিসার যাত্রাকে ব্যাখ্যা করলে আমরা আমাদের জীবনের দুর্গম পথযাত্রী সঙ্গে মিল খুঁজে পাব। একই উদ্দেশ্যে এক ভাবে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা-

"তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগযুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্জা বজ্রপাতে।"

এই দুর্গম পথ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমতি রাধিকাকে অনেক মহড়া দিতে হয়েছে। আমাদের জীবনযাত্রায় পথ খুব একটা সুগম নয়। তেমনি জটিল ক্লেদাক্ত পথ অতিক্রম করতে আমাদের ওপর সমস্ত সময় কণ্টকিত থাকে। তবুও আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইনা। দুর্গমের আকর্ষণকে এড়াতে পারিনা ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে অভিসার বর্ণিত হয়েছে তার মুল খুঁজতে গেলে সম্ভবত আমাদের স্মরণ করতে হয় সহস্র বছর পূর্বের লেখক জয়দেব গোস্বামীর। পদাবলী সাহিত্যের মূল নিহিত আছে বৈষ্ণব পদাবলীর পুরোধা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'-

রতি সুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম।
ণ কুরু নিতম্বিনী গমনবিলম্বনমনুসর ত্বং হৃদয়েশম।।

খ) অভিসারের রোমান্টিকতা

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটা রোমান্টিক সুর প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব কবিদের অনেকেই যে রোমান্টিক সৌন্দর্য রূপের পটভূমিতে যাত্রা করে ক্রমশ মানবতার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের উত্তীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কোনো

সংশয় নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যেকটি পর্যায়ে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ কবি-প্রাণকে আকুল করে তোলে। বিশেষত অভিসারের পদগুলিতে অপ্রাপ্য কে পাবার কামনা ,দূরের প্রতি আকর্ষণ, সমস্ত বাধা বিঘ্ন কে দূর করে দয়িত মিলনের জন্য নায়িকার যে তীব্র বাসনা এবং দুঃসাহসিকতা প্রকাশিত হয়েছে তাতে রোমান্টিকতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। কিন্তু অভিসার আপনি সমাপ্ত হয়নি। তার স্থির লক্ষ্য যেখানে সেখানে পৌঁছাতে পারলেই সর্ব কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি। এক রূপময় জগত থেকে রুপাতীত অলৌকিক জগতের প্রতি আহ্বান অভিসারের পদে ধ্বনিত হয়েছে। বৈষ্ণব পরিভাষায় বলা চলে অভিসারে কবি মানসের যেন রোমান্টিক জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণ ঘটেছে।

গ) অভিসারের বৈচিত্র্য

বৈষ্ণব সাহিত্যের রস পর্যায়ে এবং নায়িকার অবস্থা ভেদে বহু রূপান্তরের উল্লেখ থাকলেও অনেক পদকর্তা অভিসারের বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। অভিসারের অষ্টবিধ অবস্থা, তীর্থযাত্রাভিসারসহ কবি গোবিন্দদাস পদ বৈচিত্র সৃষ্টি করে উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। জ্যোৎস্না রাত্রে নায়িকার যে অভিসার তাকে বলা হয় জ্যোৎস্নাভিসার। অভিসারিকা নিজেকে গুপ্ত রেখে অভিসারে যাবেন, তাই বেশভূষা হবে তার উপযোগী। গোবিন্দদাস জ্যোৎস্নাভিসার বিষয়ে বর্ণনায় দেখিয়েছেন-" রঙ্গ পুতুলি যেন রস মহা বুর।" অর্থাৎ রাঙের পুতুলকে যেন পারদে ডুবিয়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যাপতির জ্যোৎস্নাভিসার বিষয়ক পদে বলা হয়েছে-

সহচরী বাত ধয়ল ধনি শ্রবণে।
হৃদয় হুলাস কহত নহি বচনে।।
সহচরী সমুঝল মরমক বাত।
সজাওল জৈসে কিছু লখই ন জাত।।

জ্যোৎস্না রজনীতে শ্বেতাম্বরে এই অঙ্গ ভূষিত করে অপরের অলক্ষ্যে সখীর হাত ধরে রাধা পবন গতিতে কুঞ্জে প্রবেশ করলেন। রজনীতে শ্রীরাধার তিমিরাভিসার কালে তাকে মিশে

যেতে হবে অন্ধকারের সঙ্গে, যাতে কারো নজরে না পড়ে। তাই গোবিন্দদাস লিখলেন-

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন

নীলিম হার উজোর।

নীল বলয়গণে ভুজ্যগমণ্ডিত

পরিহন নীল নিচোল।।

সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।

নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি

কুহু যামিনী ভয় লাগি।।

অমাবস্যা রজনীতে নীল আবরণ ও আভরণে গৌরি হল শ্যামলী।

উন্মত্তাভিসার কালে শ্রীমতির সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়। তার ব্যবহারে দেখা যায় উন্মাদের লক্ষণ। পাগলের মতোই রাধিকা হাতে মঞ্জুরি পড়েন আর হার মনে করে কিঙ্কিণী পরেন গলায়। আর হারকে তুলে দেন মাথায়। বৈষ্ণব কবিগন অভিসারের বর্ণনায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র নির্দেশকে অনেকখানি অতিক্রম করে আরও বৈচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার শীতের নিশীথ অভিসারের কথা কবিশেখর এর একটি পদে দেখা যায়-

হিমকরকিরণ হিম অনিবার।

দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার।।

বর্ষাভিসারে কবিদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গেছে। গোবিন্দদাসের 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট' এবং 'কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল' বহুশ্রুত এবং বহুল প্রশংসিত। কবিশেখর এর বর্ষাভিসারের পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গগনে অব ঘন মেহ দারুন

সঘনে দামিনী ঝলকই।

কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন

পবন খরতর বগলই।।

সজনি আজু দুরদিন ভেল।

কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি

সংকেত কুঞ্জহি গেল।।

সকালবেলার যে অভিসার তাকে বলা হয় দিবাভিসার। গোবিন্দদাস রচিত এ বিষয়ে একটি পদ-

'... গুরুজনে বাঁচি মিছই বচনামৃতে/ দিনহি করলি অভিসার'।।

কুজ্ঝটিকাভিসারে গোবিন্দদাস লিখলেন -

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।

জাগরে জর্জর মনসিজ ত্যাগি।।

দারুন গুরুজন নয়ন নিপাত।

না মিল্ল সুন্দরী ভৈ গেল পরাত।।

আজি ভেল ভালে কুঝটি আন্ধিয়ার।

ঐছে সময় ধনি চলু অভিসার।।

তীর্থযাত্রা বা দেবদর্শনের ছল করে নায়িকার যে অভিসার তাকে বলে তীর্থাভিসার।

তুলসী কহিল কানুক কথা।

যেমত তাহার হৃদয়ে ব্যথা।।

শুনি শশীমুখী বিভোর হইয়া।

বহু উপহার যত্নে লইয়া।।

সহচরীগণ লইয়া সঙ্গেল।

দেবতা পুজিতে চলিলা রঙ্গে।।

গ্রীষ্মের দাবদাহেও বৈষ্ণব কবি রাধাকে অভিসার করিয়েছেন। তেমনই একটি পদ

মাথহি তপন তপত বালুক

আতপ দহন বিথার।

সূর্য তপ্তবালুকরাশি দিগন্তবিস্তৃত। তারমধ্যে ননীর পুতুল রাধিকা শ্যামের সঙ্গে মিলনের কৃচ্ছসাধন করছেন। পুরুষের অভিসারের কথাও ' উজ্জলনীলমণি'তে রয়েছে।এমনই একটি পদ লিখেছেন রাধামোহন-

রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব

অচপল প্রেম অনুমানি।

ঘ) অভিসার পর্যায়ের পদকর্তা

অভিসার পর্যায়ের পদ রচনা মধ্যে পদকর্তা গান নিজের নিজের রুচির পরিচয় দিয়েছেন।সাধারণত দেখা যায় যারা চৈতন্য পূর্ব যুগের কবি তাদের রচনা আধ্যাত্মিকতা বর্জিত। চৈতন্য যুগের কবিদের অভিসার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরম আত্মার প্রতি জীবাত্মার অভিসারের একটি রূপ ফুটে উঠতে দেখা যায়।

১. বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি চৈতন্য পূর্ব যুগের কবি এবং সাধারণত তাকে রূপের কবি বলে অভিহিত করা হয়। অতএব তার অভিসারের পদে একটি সৌন্দর্য জগত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রূপ এবং সৌন্দর্য জগতের খ্যাতিমান কবি হওয়া সত্বেও অভিসার পদ রচনায় বিদ্যাপতি তেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন নি। বরং তার স্বভাব ধর্মের বিরোধী কিছু ভাব তিনি আরোপ করেছেন অভিসারের পদে। যেমন এজাতীয় পদে একদিকে আছে ব্যথাতুর হৃদয়ের আর্তি অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে আধ্যাত্বিকতার স্পর্শ। অথচ অভিসার জাতীয় পদে এ জাতীয় ভেদ একেবারেই অভিপ্রেত নয়।

নিত্য পহুঁ পরিহরি সঁতরি বিখম পরি

আঁগিরি মহাকুল গারী।

তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি

কিন্তু ন গুনল বরনারী।।

২. চন্ডীদাস

চন্ডীদাস ভাবজগতের কবি। অভিসারের মত রূপময় জগতের ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকার কথা নয়। তাই চন্ডীদাসের অভিসারের পদের কৃতিত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, অভিসারের পদে তিনি এক বৃহত্তর সত্য উদঘাটিত করেছেন। চন্ডীদাসের একটি অতি পরিচিত পদ- " এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা"। এটিকে অনেকে মিলনের পদ বলেন, কেউ আবার রসোদগারের পদ বলেন।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইল বাটে ।

আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে

দেখিয়া পরাণ ফাটে ।।

সই কি আর বলিব তোরে।

বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া

আসিয়া মিলিল মোরে ।।

একই পদে চন্ডীদাস আবার বলেছেন,

বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া

মোর মনে হেন করে।

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া

আনল ভেজাই ঘর।।

আপনার দুখ সুখ করি মানে

আমার দুখেতে দুখী।

চন্ডীদাস কহে কানুর পীরীতি

শুনিয়া জগৎ সুখী।।

অভিসারের পদে রাধার ব্যাকুলতা একে অন্যকে উচ্চস্তরের ভাবলোকে উন্নীত করেছে রবীন্দ্রনাথও এই পদটির প্রশংসা করেছেন।

৩. জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাসকে বলা হয় চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য। কিন্তু চন্ডীদাস যেমন প্রকৃত অভিসারের পর্যালোচনায় একেবারেই মন দেননি, জ্ঞানদাসের অবস্থা ঠিক তেমন নয়। তিনি কয়েকটি অভিসারের পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি, বিশেষত গোবিন্দদাসের অভিসারের কবিতায় যে জগতের চিত্র অংকিত হয়েছে এখানে তা পাওয়া যায় না। জ্ঞান্দাসের রাধা ধ্যানরতা ,অবস্থানগত বাস্তব দূরত্ব অতিক্রম করে তার অভিসারে গমনের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কারণ তিনি তো কৃষ্ণময় হয়ে রয়েছেন। তবু জ্ঞানদাস গতানুগতিকতার অভিসারের পদ রচনা করেছেন ।এমনকি কৃষ্ণের অভিসারের বর্ণনা করেছেন।

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারিই গেহে।
গুরুদুরুজনভয় কিছু নাহি মানয়
চীর নাহি সম্বরু দেহে।।

এজাতীয় অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।

৪. গোবিন্দদাস

বৈষ্ণব কবিদের প্রায় সকলেই অভিসারের পদ রচনা করেছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস ব্যতীত প্রায় কেউই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। বস্তুত অপর কোন কবি এই পর্যায়ে সার্থকতা লাভ করতে পারিনি। গোবিন্দদাসের একক প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদ রচনা করেছেন।গুণগতভাবে তিনি এমন স্থানে অধিষ্ঠিত যার কাছে যাওয়ার যোগ্যতা কোন কবির নেই। এক কথায় বলা চলে অভিসারে পদ রচনায় গোবিন্দদাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সম্রাট।

বৈষ্ণব ভাষাতাত্ত্বিকগণ অভিসারের যত প্রকার বৈচিত্র কল্পনা করেছেন গোবিন্দদাস তার সবকটিকেই বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু তিনি এমন কিছু অভিসারের পদ রচনা করেছেন যা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। শুধু বৈচিত্র্য বিচারে নয়,কোন কোন পদে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের সর্বোত্তম নিদর্শনগুলির অন্যতম বিবেচিত হয়েছে গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ।" কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার।/ হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।।" অথবা" কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।" বা বর্ষাভিসারের পদ " অম্বরে ডমরু ভরু নব নেহ। " পদসমুহ উল্লেখযোগ্য। দিবাভিসারের পদ "সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন", কুজ্ঝটিকাভিসারের পদ " হরি রহু কামিনী লাগি" এবং উন্মত্তাভিসারের পদ "মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি ধনী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অভিসারের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব ও তার প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশের পরিচয় মেলে চিত্রধর্মিতা, নাটকীয়তা ও গীতিপ্রাণতায়। গোবিন্দদাসের বিখ্যাত পদ -

কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলইতে অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কন পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই

আন শুনই কহ আন।

পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই

গোবিন্দদাস পরমাণ।।

এখানে বলা হয়েছে রাধা তিমির অভিসারে যাবেন ।বর্ষা রজনীতে গৃহে চলছে দুর্গম পথ চলার সাধনা। পথ চলতে গেলে পায়ে কাঁটা ফুটতে পারে, তাই তিনি আঙিনায় কাটা পুতে পথ চলা অভ্যাস করছেন। শ্রীমতীর কমলসম পদতলে রয়েছে নুপুর, পথ চলার সময় নুপুরের শব্দ অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, অতএব বস্ত্রখণ্ড দিয়ে নূপুর ঢেকে নিচ্ছেন। বর্ষার পথ কর্দমাক্ত হবে তাই আঙিনায় জল ঢেলে পিছল করে নিয়ে পা টিপেটিপে প্রবেশ করছেন। যাতে পথে পা হড়কে না যায় এজন্যে অঙ্গুলি চেপে পিছল পথে চলা অভ্যাস করছেন। আর তাই কলসির জল ঢেলে আঙিনা পিছল করে নিচ্ছেন। রাত্রিকালে আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন রাধা।

অপর একটি পদ,

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।

চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।

তহিঁ অতি দুরতর বাদল দোল।

বারি কি বারই নীল নিচোল।।

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।

হরি রহ মানস সুরধনি পার।।

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।

শুনইতে শ্রবন মরম মরি যাত।।

এখানে গোবিন্দদাস যাত্রার পূর্বে পথে দুর্গমতা ও অন্যান্য অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভাব্য স্বার্থকতা বিষয়ে রাধার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন। গোবিন্দদাসকে অভিসার পর্যায়ের রাজাধিরাজ করে তুলেছে এই সমস্ত পদ।

৬.৫ আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য

ক) আক্ষেপানুরাগ

আক্ষেপানুরাগ কে প্রকৃতপক্ষে অনুরাগের ত্রিবিধ ও চতুর্বিধ রূপের অপর একটি বলে রসশাস্ত্র কারবন মনে করেন। অনুরাগের আধিক্যের কারণে উদভ্রান্ত হয়ে অনুপস্থিত প্রিয় স্বজন অথবা নিজেকে নিয়ে আক্ষেপ করাকে আক্ষেপানুরাগ বলা হয় ।অবস্থা অনুযায়ী প্রকাশিত আক্ষেপানুরাগকে আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ , সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতির প্রতি আক্ষেপ, মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ,কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ।

প্রেমবৈচিত্ত এবং আক্ষেপানুরাগ এর প্রকৃত স্বরূপ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বৈষ্ণব তাত্ত্বিক কালিদাস রায় বলেছেন আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্তের মধ্যে একটা সুক্ষ পার্থক্য আছে।

প্রণয়ীজন কণ্ঠাশ্লিষ্ট থাকলেও উপভোক্তা মিলন নায়িকাদের যদি হয় তবে তাকে প্রেম বৈচিত্র বলা হয়। তিনি বলেছেন রাধার অনুরাগই আক্ষেপানুরাগ। রাধার অনুরাগ অসীম। প্রকৃতপক্ষে পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত রাধার জীবনের প্রত্যেক লীলা বৈচিত্রে এই আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়েছে।প্রেমের উৎকর্ষতা এবং এই প্রেমের উৎকর্ষের জন্য ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ এরমধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিরহের সুর বর্তমান।

খ) প্রেমবৈচিত্ত্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রধানত বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী রসশাস্ত্র দ্বারা অনুশাসিত বলে রসশাস্ত্রে উল্লেখ করা পঞ্চরসকে স্বীকৃতি জানালেও শৃঙ্গার রস বা মধুর রসকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতি। কারণ রসশাস্ত্রে বর্নিত হয়েছে মধুর রসের উৎকর্ষের কথা। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' তে মধুর রসের দুটি ভাগ করা হয়েছে। 'বিপ্রলম্ভ' এবং 'সম্ভোগ'। বিপ্রলম্ভের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রেমবৈচিত্ত্য। এখানে প্রেম বৈচিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষে হপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবাবতঃ ।

যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্তমুচ্যতে।।

এছাড়াও কবি বলেছেন 'প্রিয়ের নিকট রহে' ও 'প্রেম সন্নিকর্ষে' প্রেমের স্বভাবে বৈচিত্র হেতু বিরহ ভয়ে কাতরতা প্রকাশিত হলে, তাকেই প্রেম বৈচিত্ত বলে। অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকা নিকটে থেকেও বিচিত্রতা বা ব্যাকুলতার জন্য বিচ্ছেদ ভয় কাতরতা প্রকাশ যখন করেন তখনই প্রেমবৈচিত্ত্য হয়।

প্রেমবৈচিত্ত যদিও বিপ্রলম্ভ এর অন্তর্ভুক্ত এবং নায়ক-নায়িকা থাকে বিচ্ছিন্ন অথবা যুক্ত। অনুরাগের ভাবপ্রকাশের অভাব ঘটে তবুও প্রেমবৈচিত্তে কিন্তু নায়ক-নায়িকা মিলিত অবস্থায় থাকে এবং এটি মনে হয় যেন সম্ভোগেরই অঙ্গ। তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।না হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বাস্তবে অনেকেই প্রেমবৈচিত্ত ও আক্ষেপানুরাগকে এক এবং অভিন্ন মনে করে থাকেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে প্রেমের গভীরতার জন্য বিরহ বোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্রজবুলি ভাষায় এই সমস্ত আক্ষেপানুরাগের পদ বহু পরিমাণে থাকলেও প্রেমবৈচিত্তের পদ সংখ্যা সীমিত।

গ) আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্তের বিশ্লেষণ

প্রেমবৈচিত্ত চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভের অন্যতম। এর মূল সুর বিরহ বা বিচ্ছেদ কাতরতা এবং পটভূমিতে রয়েছে রাধা কৃষ্ণের মিলন মুহূর্ত।সেই মিলনেও যখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তখনই তাকে প্রেমবৈচিত্ত বলে। আক্ষেপানুরাগ বস্তুত অনুরাগের ত্রিবিধ ও চতুর্বিধ রূপের অন্যতম। কিন্তু অনুরাগ রূপের বিশেষ কোন ভাব, রস বা পর্যায়ের কথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বলা নেই। তবে বারবার প্রিয়দর্শন নিমিত্ত যে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মিলনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যে অনুরাগ, 'উজ্জ্বলনীলমণি' তে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেখানে অনুরাগ এর বিভিন্ন রূপের মধ্যে স্থান পেয়েছে এই আক্ষেপানুরাগ। এর মূলে রয়েছে কৃষ্ণের অদর্শন এবং তার জন্যই শ্রীরাধার আক্ষেপ।এই আক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কন্দর্প কৃষ্ণ, বিধাতা ,গুরুজন, সখি, দুতী, মুরলী এমনকি রাধা নিজেও। শ্রীমতির আক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে

অনুযোগ। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন তার মনের উপর বিচ্ছেদের বিষন্নতার ছায়া ফেলেছে। শ্রীরাধা শ্রী কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া, তাই তাকে বাস্তবে কৃষ্ণ কোনদিনই উপেক্ষা করতে পারেন না। তাহলে রস বিচ্যুতি ঘটবে। প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহ ,বিভ্রান্তি, আক্ষেপানুরাগ সেরকমই এক ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির জন্যেই চমৎকারিত্বে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে উপেক্ষা করেননি। রাধার মনের ভ্রান্তির জন্য এই আক্ষেপ।

চন্ডীদাসের রাধা বলেন

ঘর কৈনুঁ বাহির বাহির কৈনুঁ ঘর।
পর কৈনুঁ আপন আপন কৈনু পর।।
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিকরুণ হও।
মরিবো তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।

রাধার হতাশার চরম রূপ প্রকাশিত হয় রাধার এক উক্তিতে,

বন্ধুর লাগিয়া ঘর তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় আন জন ইহা কি পরাণে সয়?
সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বধুয়াঁ আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া।
বন্ধুর হিয়া এমন করিল না জানি সে জন কে?
আমার পরান যেমন করিছে তেমনি হউক সে।।

এই হতাশার বোধই আক্ষেপানুরাগ এর পদ পর্যায়ের প্রত্যেক জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই নৈরাশ্য থেকেই রাধার মনেও বৈরাগ্য জন্মায়। জ্ঞানদাসের ভাষায়

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল ।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।।

রাধার আক্ষেপের মূলে রয়েছে অতৃপ্তি, যা পেয়েছে তাতে তার তৃপ্তি নেই ।তাই সবসময় হারাই-হারাই মনোভাব ।এই ভয়তেই কোন আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন না সে। তাই কবিবল্লভের রাধা বলেন-

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ

নয়ন না তিরপিত ভেল ।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ

তবু হিআ জুড়ন না গেল।

কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া, আপন করে পাওয়া ,এমন করে পাওয়া- যার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। তেমন হবার জন্য রাধার আগ্রহ। না পাওয়াতেই অতৃপ্তি।জ্ঞানদাসের রাধা তাই বলে-

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরান পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

প্রেমবৈচিত্তের অপর একটি বৈশিষ্ট্য- সবকিছুর উদ্দেশ্যেই রাধা নিজের ওপর আক্ষেপ কম নয়, বরং নিজেকে নিজের দোষের জন্য রাধা ধিক্কার দেন। সর্বশেষ রাধা সারসত্য বুঝেছে সর্বস্ব ত্যাগ করে কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি বিবাগী হবেন। তাই সখি কে ডেকে বলছেন-

সখিহে আপন ঘরে যাও।

জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে

তারে তুমি কি আর বুঝাও।।

সব আক্ষেপ দূর হতে পারে একটি উপায়। প্রেমের সাগরে ভেসে যেতে হবে। কুলের

মায়া ত্যাগ না করলে চলবে না । এই মায়া থাকলে কোনদিনই আক্ষেপের নিবৃত্তি ঘটবে না। অতএব

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি

যার যেবা মনে লয়।

ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বন্ধু বিনু

আর কেহ মোর নয়।।

মনে মনে স্থির করেছে নিয়েছেন বলে রাধার স্বামী মা-বাবা কারুর কথা ভাবতে পারছেন না ।সহজ সমাধান করে রাধা বলছেন

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি

কিবা বলিবে বাপমায়।

জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন

নিছনি সঁপিব শ্যাম পায়ে।।

ঘ) আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্তের পদকর্তা

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বহু কবি আক্ষেপানুরাগের পদ রচনা করেছেন।কবিবল্লভ বা বিদ্যাপতি রচিত 'জনম অবধি হাম' একটি বিশিষ্ট আক্ষেপানুরাগের পদ এর ব্যাতিক্রম। গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, কবিশেখর প্রমুখেরা আক্ষেপানুরাগে কিছু কিছু বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হলেন জ্ঞানদাস ও চন্ডীদাস।

১. চন্ডীদাস

চন্ডীদাসের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রেমানুভূতির অনুভবকে ও অন্তর্মুখীনতাকে তিনি রাধা চরিত্রের মধ্যে আরোপ করেছেন।আক্ষেপানুরাগ এর পদ রচনাতে তিনি প্রগাঢ়তা দেখিয়েছেন, এমনকি রাধার ভাবতন্ময়তা যেভাবে দেখিয়েছেন তা পূর্বরাগ অপেক্ষাও গভীর। আক্ষেপানুরাগের যেসকল কবি আছে, তাদের রাধিকা অহংকার ত্যাগ করতে

পারেননি। তাই আক্ষেপের সঙ্গে অনুযোগ বর্তমান। কিন্তু চন্ডীদাসের রাধিকার মনে কোন অনুযোগ নেই অভিযোগ নেই। তিনি তার সর্বস্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন

কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর ।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।

এভাবেই অপেক্ষাতে তার দীন কাতে।কিন্তু এর পর যখন তার 'বধুয়াঁ আন বাড়ি যায়' তারই আঙিনা দিয়ে,তখন জ্ঞানদাসের রাধার মত নিজের কেশ ছেঁড়েন না,বরং অভিশাপ দেন

যুবতি হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।

চণ্ডীদাসের রাধা দিনকে রাত,রাতকে দিন করে প্রকৃতির বিধান বদলে দিতে চান।তবু বলেন

বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি।
কোন বিধি সিরজিল সতের শেঁওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।

এখানে চন্ডীদাস যে বেদনাবোধের, দুঃখের নিবিড়তার পরিচয় দিয়েছেন তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই পদটি। কৃষ্ণকে পাবার জন্য রাধা অসাধ্য সাধন করেছে ।এমনকি প্রাকৃতিক বিধান পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাকে পাচ্ছেন না। কৃষ্ণ যদি রাধার প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ বজায় রাখে তবে রাধার নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি থাকবে না। তিনি কৃষ্ণের সামনে দেহত্যাগ করবেন। প্রেম যে জীবনের চেয়েও বেশি,তেমনই একটি খণ্ডচিত্র এই পদটি তুলে ধরে।

আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার শেষ অবস্থা দাঁড়ায়-

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া

ফুঁকরি কাঁদিতে নারে।।

চন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমের দারুন বেগে কেবল ভেসে চলেছেন, তবু কুল পাচ্ছেন না।

নিতান্ত অসহায় এই রাধা।

এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।

এই দুঃসময়ে যদি কৃষ্ণ তার পাশে এসে না দাঁড়ান, তবে আত্মবিসর্জন ছাড়া সত্যিই এই রাধার আর কোন গতি নেই।

২. জ্ঞানদাস

আক্ষেপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস অসাধারণ কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ জাতীয় পদে রাধার সঙ্গে কবি যেন একাত্ম হয়ে গেছেন। জগৎজীবন বা প্রেমানুভূতি সবই তিনি রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে উপলব্ধি করেছেন। চন্ডিদাসের মত জ্ঞানদাসের রাধার মধ্যেও কবিসত্তা আরোপিত হয়েছে। এ বিষয়ে সমালোচকদের মন্তব্য-

"আপনসৃষ্ট রাধিকার সঙ্গে জ্ঞানদাস প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছেন; তাই রাধারই বেদনায় কবির হৃদয়ের সবকটি তারে ঝংকার উঠেছে।এই অর্থে জ্ঞানদাস লিরিক কবি। লিরিক কবি আপন ব্যক্তিসত্তার রঙের সবকিছুকে রঞ্জিত করেন। জ্ঞানদাস রাধার মধ্যে দিয়ে আপনার দেখা দেখেছেন এবং রাধার ভালোবাসায় আপন মনের রং লাগিয়েছেন।"

আক্ষেপানুরাগে জ্ঞানদাসের রাধার যে প্রেম তা

হিয়ার হইতে পিয়া সেজে না ছোঁয়ায়।

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।।

কিন্তু তার পরিণাম রাধাকে চোখের জলে দিতে হয়। যত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাধা ঘর

বেঁধেছিলেন তা

শেষ হয়ে যায়।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল ।

অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।।

রাধা কৃষ্ণপ্রেমের বশীভূত হয়ে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছেন-

তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।

যেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা থাকি বুকে।।

এমনভাবে কৃষ্ণ প্রেমাতুরে হয়েও রাধার চিত্তের সুখ নেই। কৃষ্ণ বিরহে তার জীবন কাটতে চায় না। সখীরা সান্ত্বনা দেয় কিন্তু তাতে রাধার অন্তরে আরো ব্যথা বাড়ে। তাই তিনি সখীদের বলেন

নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল।

এভাবেই জ্ঞানদাসের রাধা দিনের-পর-দিন কৃষ্ণের পথ চেয়ে কাটিয়ে দেয় ।

৬.৬) অনুশীলনী

প্রশ্ন১. গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে? চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে রচিত গৌরপদাবলীর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ মাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয়। এই মন্তব্যের আলোকে বৈষ্ণব পদাবলীর রস আস্বাদনে গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন ৩. বৈষ্ণব পদাবলী পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ের পদগুলির ভাবসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ৪. বৈষ্ণব রস পর্যায়ে 'পূর্বরাগ' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পূর্বরাগ রচনায় পদকর্তাদের অবদান আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৫. গৌড়ীয় বৈষ্ণব এর দৃষ্টিতে অভিসার পর্যায়ের তাৎপর্য কি? এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে? পদ রচনায় তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৬. অভিসার পর্যায়ের পদগুলির তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে পদ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ৭. প্রেমবৈচিত্ত ও আক্ষেপানুরাগের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এই পর্যায়ের পদ আলোচনা করে চন্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।

প্রশ্ন ৮. বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমবৈচিত্ত পর্যায়ের পদগুলির কাব্য তাৎপর্য আলোচনা করে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ও তারপর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

প্রশ্ন ৯. আক্ষেপানুরাগ শীর্ষক পর্যায়টির বৈষ্ণবীয় অভিনবত্ব কি আলোচনা করো। প্রেমবৈচিতত্তের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ কর।

৬.৭) গ্রন্থপঞ্জি

১. বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

২ বৈষ্ণব সাহিত্য সমীক্ষা, শ্রীমন্ত কুমার জানা

৩ বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ বৈষ্ণব পদাবলী, সত্য গিরি

একক ৭। পদাবলীর পর্যায় বিভাগ

পদ পর্যায় - মাথুর , আত্মনিবেদন , ভাবসম্মিলন , প্রার্থনা

বিন্যাস ক্রম

৭.১) মাথুর

ক) বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস

খ) অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস

গ) বিরহের চাতুর্মস্যা ও বারমাস্য

ঘ) মাথুরের আধ্যাত্মিকতা

ঙ) বিরহের উৎকর্ষতা

চ) মাথুরের কবিগণ

১. বিদ্যাপতি

২. চন্ডীদাস

৩. গোবিন্দদাস

৭.২) আত্মনিবেদন

৭.৩) ভাবসম্মিলন

ক) ভাবোল্লাস এর কবিগণ

১. বিদ্যাপতি

২. চন্ডীদাস

৩. জ্ঞানদাস

৭.৪) প্রার্থনা

৭.৫) অনুশীলনী

৭.৬) গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ মাথুর

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের যে চতুর্বিধ রূপ কল্পনা করা হয়েছে তার শেষতম হল প্রবাস। শ্রীমদভাগবতে প্রেমবৈচিত্ত নেই। তার স্থানে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে আছে 'প্রবাস' এবং চতুর্থ স্থানে আছে 'করুণ'। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রবাসের সংজ্ঞা দিতে বলা হয়েছে-

পূর্বসঙ্গতয়োর্যুনর্ভবন্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে।।

অর্থাৎ পূর্বে সম্মিলিত নায়ক নায়িকার মধ্যে দেশ দেশান্তরের যে ব্যবধান তাকেই প্রজ্ঞাগন প্রবাস নামে অভিহিত করে থাকেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে নায়কের প্রবাস বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা চলে গেলেন- প্রবাসের এই একমাত্র বিষয়। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রবাসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন শ্রী রূপ গোস্বামী।সেগুলি হল বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস এবং অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস।

ক) বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস

বিশেষ কাজের প্রয়োজনে স্থানান্তর গমনকে বুদ্ধি পূর্বক গমন বলে। এই প্রবাস দুরকম হতে পারে। অদূর প্রবাস এবং সুদূর প্রবাস। কালের হিসেবে সুদূর প্রবাস তিন প্রকার- ভূত, ভবন, ভাবি।

'হরি কি মথুরাপুর গেল । আজু গোকুল শুনো ভেল।'।

কৃষ্ণ মথুরা চলে গেলে আর ফিরে এলেন না ।অতীতকালের এই প্রবাসকে বলা হয় ভূত বিরহ। আবার,

'কাল বলি কালা গেল মধুপুরে । সে কালের আর কত বাকি।'।

ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ণ মথুরা গেছেন কিন্তু আর ফিরে আসছেন না ।শ্রীমতী এই যে বিরহ জ্বালা ভোগ করছেন, একে বলা হয় বর্তমান অর্থাৎ ভবন বিরহ।

কিয়ে সখি চম্পকদাম বনায়সি।
করিইতে রভস বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর মধুপুর।
ব্রজ পুর করি আন্ধিয়ার।।

ব্রজপুর আঁধার করে নায়ক মধুপুর চলে যাবেন। কাজেই আর ব্যবহারের জন্য চম্পকদাম নিয়ে লাভ নেই। ভাবীকালের জন্য এই যে বিরহ একে বলা হয় ভাবী বিরহ।

ভাবি, ভবন ,ভূত বিরহের ব্যাখ্যা আরো একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে করা যায়। যেমন কৃষ্ণকে মথুরা নিয়ে যেতে অক্রুর আসছেন। যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। আশঙ্কায় রাধামন ব্যাকুল।এটি ভাবী বিরহ। বিরাট রথ দুয়ারে প্রস্তুত। অক্রুরসহ কৃষ্ণ রথের উপর রয়েছেন। রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে অশ্ব। এটি ভবন বিরহ। কৃষ্ণ রথে চড়ে চলে গেলেন কৃষ্ণ বৃন্দাবন অন্ধকার করে।এটি হলো ভূত বিরহ।

ভূত, ভবন, ভাবি এই তিন মিলিয়ে যে সুদূর প্রবাস তৈরি হয় তাকে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রবাসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সুদুর প্রবাসই পদাবলী সাহিত্যে প্রবাসের মর্যাদা পেয়েছে। এক ও অদ্বিতীয় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ চলে গেছেন এবং পুনরায় ফিরে না আসার জন্যই এই বিরহ। একে ছাড়া আর এক প্রকার প্রবাস আছে যাকে বলা হয় অদূর প্রবাস। কালিয়দমন, বাঁশি অন্তর্ধান ইতাদি কারণে কৃষ্ণ যখন সাময়িকভাবে অদর্শন হতো, তখন তাকে অদুর প্রবাস বলত।রাধা এবং বৃন্দাবনের গোপীরা কৃষ্ণের সাময়িক আদর্শন নিয়ে যথেষ্ট বিরহ কাতর হয়ে পড়তেন। তার সন্ধানে তৎপর হতেন। অবশ্যই এর পরে তাদের পুনর্মিলন ঘটে।

খ) অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রকার প্রবাসকে বলা হয়েছে অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস। পরাধীনতার জন্য যে প্রবাস তাকে বলা হয় অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস।সুদূর প্রবাস বা অদূর প্রবাস যেমন নায়ক-নায়িকা স্বেচ্ছায় বা কাজের অনুরোধকৃত, অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস তেমন নয়। এখানে নায়ক বা নায়িকার স্বাধীন ইচ্ছার কোনো স্থান নেই ।যেমন শঙ্কচূড় যখন শ্রীমতি রাধাকে হরণ করে নিয়ে গেল তখন শ্রীমতির এই সাময়িক আদর্শন ছিল ও বুদ্ধিজাত প্রবাস।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে যাকে 'সুদূর প্রবাস' বলা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাকেই মাথুর বলা হয়েছে ।শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন এবং দীর্ঘকালের জন্য তাঁর অদর্শন রাধার এবং কৃষ্ণপ্রাণা গোপীদের মধ্যে যে বিরহ জ্বালা সৃষ্টি করেছিল, তাকেই নানা প্রকারে প্রকাশ করেছেন মাথুর পর্যায়ের কবিরা। এই পর্যায়ের একমাত্র রস করুণরস। প্রধানত মাথুর পর্যায়ের পদ গুলি বিরহের পদ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সাময়িক বিরহ বিচ্ছেদের পদ।বিরহকে বৈষ্ণব কবিরা সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের বিরহের কবি বলে আখ্যা দেয়া হয়। তবে লক্ষণীয় যে চন্ডিদাসের মত কবিগণ যে কোনভাবে যেকোনো পর্যায়ে পদেই বিরহের স্পর্শ অনুভব করেছেন। শুধু প্রবাস নয়, পূর্ণমিলনেও তাদের বিরহের সুর স্পষ্ট।

গ) বিরহের চাতুর্মস্যা ও বারমাস্য

বৈষ্ণব কবিতার রাধা বিরহের চাতুরমাস্যা, বারোমাস্যা প্রভৃতি রচনায় বৈষ্ণব কবিরা বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলোর একটি বিশেষত্ব হলো তার বারোমাস্যা। এই বারোমাস্যা বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টিতে মাথুর পর্যায়কে মহাকাব্যের মত করে তুলেছে। এই বার মাসের উৎকর্ষ বিষয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন, কবিতাগুলি পদবিন্যাসে মাধুর্যে, বৈচিত্রে, চাতুর্যে, অলঙ্করণের ঐশ্বর্যে জগতের বিরহ সাহিত্যে অপূর্ব অবদান রেখেছে। বড়ু চণ্ডীদাস সর্বপ্রথম বিরহের পদ রচনা

করেছিলেন। আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত চার মাসকাল বাংলায় প্রকৃত অর্থে বর্ষাকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিগণ বিরহের কাব্য গড়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মেঘদূতের কাহিনী। যেখানে আষাঢ়ের প্রথম দিনে কান্ত বিরহ কাতর যক্ষ আকাশে নবমেঘের অভ্যুদয়কে লক্ষ্য করে বিরহ কাতর হয়ে উঠেছিল।পদাবলী সাহিত্যের রাধার বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং শীতকালের বিরহ বর্ণনা করা হয়েছে।

রাধার বর্ষার বিরহ বর্ণনা

কুলিশ কত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।।

রাধার হেমন্ত বিরহ বর্ণনা

আঘন মাস রাস রসসায়রে নায়র মাথুর গেল।
পুরবাসিনিগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল।।

রাধার বসন্তে বিরহ বর্ণনা

চৌদিশ ভ্রমর ভ্রম কুসুমে কুসুমে রম
নীরসি মাজুরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহুকুহু কুহ শুনি
বিরহিণী কৈসে জীবই।।

পদকল্পতরুতে রাধা বিরহের যে বারমাস্যার বর্ণনা আছে তার প্রথম দুই মাসের পদ রচনা করেছেন বিদ্যাপতি, চার মাসের পদ রচনা করেছেন গোবিন্দদাস এবং শেষ ছয় মাসের পদ লিখেছেন গোবিন্দ চক্রবর্তী। গোবিন্দদাস কবিরাজ স্বয়ং অগ্রহায়ণ মাস থেকে বারমাস্যার পদ লিখেছেন বলে জানা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মাঘ মাসে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বলে অনেক বৈষ্ণব কবি ফাগুন মাস থেকে বারমাস্যা আরম্ভ করেছেন। কৃষ্ণের প্রবাসযাত্রার সঙ্গে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় একই তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেন।

ঘ) মাথুরের আধ্যাত্মিকতা

মাথুরকে অবলম্বন করে অনেকেই এর একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। কালিদাস রায় বলেছেন "এই মাথুরের নানাভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বৃন্দাবনকে লীলাভূমি বা স্বপ্নজগৎ এবং মথুরাকে সত্যলোক বা জীবনসংগ্রামের কর্মক্ষেত্র মনে করিয়া একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে।... আরেকটি ব্যাখ্যা এই। ভগবান বলেন 'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি।' তিনি সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসেই বশীভূত।'' মাধুর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের ভাব এসে পড়লে বাহুবন্ধ শিথিল হয়ে পড়ে। আর তিনি লীলা ভুবন ত্যাগ করে চলে যান। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মাথুর আসে। যৌবন হলো বৃন্দাবন। যৌবন ত্যাগই হল মাথুর। যৌবন প্রেমের মধ্যে দিয়ে যা উপলব্ধি করে, যৌবনের অভাবে তা বিলুপ্ত হয়।এই ব্যাখ্যা সার্বজনীন। রাধাবিরহ মানবাত্মার চিরন্তন বিরহের সাহিত্য রূপ। পূর্ণের সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ,সেই বিচ্ছেদ বেদনায় মানুষ মাত্রই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির বৈচিত্র সেই বেদনাকে জাগিয়ে তোলে। মানসিক চিত্তকে অকারণে উদাসী করে দেখে রবীন্দ্রনাথ এই বেদনাকেই সংগীতের মধ্যে দিয়ে বাণীরূপ দিয়েছেন।

ঙ) বিরহের উৎকর্ষতা

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কৃষ্ণগতপ্রানা রাধা এবং গোপীদের মনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণের মধুর আগমনকে উপলক্ষ করেই। বিরহিণী নারি চিত্তবৃত্তির অনুসরণে বৈষ্ণব কবিরা মথুরাগমন আরম্ভের পর্ব থেকে তাদের বিচিত্র মনোভাব বর্ণনা করেছেন। একসময় একটি গুজব শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণ নাকি ব্রজ ছেড়ে মথুরা যাবেন। কথাটি রাধারানীর কানে পৌঁছলে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না-

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই।
তোমরা যে বলো শ্যাম মধুপুরে যাইবেন

সে কথা তো কভু শুনি নাই।।

একথা রাই বিশ্বাস করেন না। এই কারণে 'হিয়ার মাঝারে মোর ঘর মন্দির গো' যে হৃদয়ের মধ্যে শ্যাম আছেন, সেখান থেকে তিনি কি করে বেরোবেন -

এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো

তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে।।

রাধা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে শ্যাম কখনোই যেতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্যি হল না। অক্রুর এসে ঘোষণা করল 'কালি কালিহুঁ সাজ'। আজ রাত্রি প্রভাতেই কৃষ্ণকে নিয়ে এসে মথুরা রওনা হবে। তাই এই রাত যেন আর শেষ না হয়। এটি রাধার অন্তরের একান্ত কামনা -

যোগিনী চরণ শরণ করি সাধহ

বান্ধহ যামিনীনাথে।

নখতর চান্দ বেকত বহু অম্বরে

যৈছে নহত পরভাতে।।

অন্যদিকে সখীরা নিত্যকর্ম মত মালা গাঁতছে, চাঁপা ফুল তুলে রাখছে ...

কিন্তু কি হবে এসব দিয়ে –

কিয়ে সখি চম্পক দাম বানায়সি

করইতে রভস বিহার।

সো বর নাগর যাওব মধুপুর

ব্রজপুর কড়ি আন্ধিয়ার।।

ব্রজপুর অন্ধকার করে কৃষ্ণ যখন মথুরা চলে যাবেন তখন আর এইসব কুসুম দিয়ে কুঞ্জ সাজানো প্রয়োজন নেই। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ মথুরা চলে গেলেন। ফলে ব্রজের অবস্থা হল

গোকুলে উছলল করুণা রোল।

নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।

শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।।

কৃষ্ণের অভাবে গোকুলে কান্নার রোল পড়ে গেল। চারিদিকে শুধুই শূন্যতা। কৃষ্ণ বিহীন জীবনে আর কোন সার্থকতা নেই। কৃষ্ণের মথুরা গমন এর সঙ্গে সঙ্গেই রাধার জীবনের সাধ আহ্লাদ সবই শেষ হয়ে গেছে। অথচ কৃষ্ণকে আনন্দ রাখবার জন্য, তার যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্য রাধা কখনো বুকে বসন ,চন্দন বা হার পর্যন্ত পরিধান করতেন না। সেই কৃষ্ণ যখন তাকে ছেড়ে এত দূরে নদী পাহাড়ের অন্তরালে চলে গেছেন তখন -

চীর চন্দন উরে হার না দেলা।

সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।।

এই ভাবে দিন চলে যায়। ক্রমে যখন দুরন্ত বর্ষা আসে বিরহিনী রাধার মন তখন আর যেন শান্তি পায় না।তখন বিদ্যাপতি বলেছেন

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর ।।

ঝাম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুন

সঘনে খর শর হন্তিয়া।।

কুলিশ শত শত পাত মোদিত

ময়ুর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।।

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে কংস নিধনের জন্য মথুরা চলে গিয়ে আর ফিরে এলেন না।তাই রাধা এমন বিরহ মগ্ন। এমন সময় যখন বর্ষা এলো আলোচ্য পদটিতে বর্ষার রূপ ও

অন্যদিকে বর্ষা অবলম্বন করে রাধার মনোজগতের রূপ একসাথে ফুটে উঠল।হে সখি আমার দুঃখের সীমা নেই এই ভরা বর্ষা ভাদ্র মাস অথচ আমার মন্দির শূন্য। বর্ষা প্রবল। গগন গর্জন করছে আর ভুবন ভরে বর্ষণ হচ্ছে। আমার কান্ত আজ প্রবাসী। কামদেব ঘনঘন খর শর নিক্ষেপ করছেন। শতশত বজ্রপাতের শব্দে আমোদিত ময়ূর মেতে উঠে নৃত্য করছে আর কৃষ্ণ বিরহ আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।অন্ধকারে দশদিকে অস্থির বিদ্যুতের চমক দেখা যাচ্ছে। এসময় বিদ্যাপতি বলেন রাধা বিরহ উদযাপন করবেন।জীবন যৌবন দিয়ে যাকে চিরকাল অন্তরের নিধি করে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি আর তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন না। কৃষ্ণের ব্যবহারের রাধার নিকট অসম্ভব বলে মনে হচ্ছ। অনুভবী কানুর পিরীতি অনুমানে বিনির্মাণ-

অংকুর তপন তাপে যদি জারব

কি করিব বারিদ মেহে

এ নব যৌবন বিরহে গঙায়ব

কি করব সো পিয়া লেহে ।।

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশ।

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব

কো দূর করব পিয়াসা।।

চন্দন তরু যব সৌরভ ছড়ব

শশধর বরিখব আগি।

চিন্তামণি যব নিজগুন ছড়ব

কি মোর করম অভাগি।।

এই নবীন বয়সে নবীন প্রেম যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় তারপরে জলসেচন তা আর বেঁচে উঠবেনা। যদি বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তবে পরে আর কৃষ্ণ প্রেমে কি লাভ।কবি বলেন সূর্যতাপে অঙ্কুরই যদি জরজর হয়ে যায় তবে তার জল দানকারী মেঘ কি করবে। নবযৌবন যদি বিরহে কাঁদে তবে সেই প্রিয় কান্তের স্নেহ দিয়ে আর কি হবে। কেন এমন

দুর্দশা ঘটল এর উত্তর রাধা হরির কাছে চেয়েছে। সিন্ধু নিকটে থাকতে যদি কণ্ঠ শুকিয়ে যায় তবে কিভাবে পিয়াসা দূর হবে। চন্দন গাছ যখন সৌরভ হীন হয় ,চন্দ্র যখন অগ্নি বর্ষণ করে, চিন্তামণি যখন নিজ গুণ ত্যাগ করে তখন এই অভাগীর কর্মফল ছাড়া আর কি বলা যায়। শ্রাবণ মাসে মেঘ বারি বর্ষণ করবে না, কল্পতরু থাকবে বন্ধ্যার মতো- গিরিধারী কৃষ্ণকে সেবা করেও ঠাঁই পাওয়া যাবেনা। বিদ্যাপতি যেন এসব দেখে ধাঁধায় পড়ে গেছে।

রাধার এই বিরহ ব্যাকুলতা সখীদের অন্তর্বেদনা সৃষ্টি করেছে ।তারা রাধাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত হোন না ।তিনি যে এখনো কৃষ্ণ বিরহে বেঁচে রয়েছেন এটা তার পক্ষে যেন লজ্জার বিষয়।

শুন সখী কি বোলব তোয়।
নিলজ প্রান সহজে রহু মোয় ।।
সো গুননিধি ওযদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক জীবইতে লাজ রহু মোর।।

কৃষ্ণহীন জীবনে তিলেকের জন্য বেঁচে থাকার তার কাছে লজ্জার বিষয়। হয়তো তিনি বেঁচে থাকবেন না তবুও তার মৃত্যুর পরও যেন কৃষ্ণ একবার ব্রজে ফিরে আসে। তার প্রিয়জনদের দেখা দিয়ে যান। রাধা যে মল্লিকা চারা পুঁতে রেখে যাচ্ছেন তা যেন দেখে যান।এখানে কৃষ্ণের সখা ও মা যশোমতি আছেন।রাধা কৃষ্ণের কাছে সখীকে এই বলে দুতি করে পাঠালেন। সখী তাকে আশ্বাস দিলেন এবং সুখী সন্ধান করে কৃষ্ণ কে আবিস্কার করলেন। তাঁকে জানালেন শ্রীমতীর অবস্থা প্রায় অন্তিম। রাধার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে -

মন্দ মলয়ানিল বিষসম মানই
মুরছই পিককুল রাবে।

মাথুর পর্ব এখানেই শেষ হয়েছে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর মধ্যে একটু আশার আলো

দেখা যাচ্ছে এবং পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কেউ কেউ মথুরাতে ও রাধা কৃষ্ণের মিলন দেখিয়েছেন।

চ) মাথুরের কবিগণ

১. বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতিকে সাধারণত দেহ বিলাস এবং সম্ভোগের কবি বলা হলেও বিরহের পদ রচনাতে সম্ভবত তাঁর কৃতিত্ব অন্যান্য কবিদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই বিরহের পদগুলোকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে দেখা যায় ভোগ-বিলাসের প্রতি রাধার আকর্ষণ। কৃষ্ণ বিরহ যেন তার কাছে ভোগ বিরহের চিহ্ন। তাই তিনি বলেন

অংকুর তপন তাপে যদি জারব

কি করিব বারিদ মেহে

এ নব যৌবন বিরহে গঙায়ব

কি করব সো পিয়া লেহে ।।

দ্বিতীয় স্থানে ভোগ বহ্নি কিছুটা প্রশমিত হলেও উদ্বেলতা বর্তমান। এই স্তরে রাধা কৃষ্ণের প্রতি যেন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন -

যৌবন রূপ আছল দিন চারি।

সে দেখি আদর কএল মুরারি।।

তৃতীয় স্তরে বিরহবহ্নিতে দগ্ধ রাধা যেন সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে ।এখন রাধা বিষাদের প্রতিমা। তার শূন্যতাবোধ শুধু রাধাকে নয়, পাঠককেও স্পর্শ করে।

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।

শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।।

চতুর্থ স্তরে রাধার বিরহিণী রূপটি ফুতে ওঠে। ভোগ আকাঙ্ক্ষা, প্রগলভতা সমস্ত স্থিমিত হয়ে এক শান্ত মূর্তি ধারণ করেছে এই রাধা।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিদ্যাপতির বিরহ পদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন " অভিসারের

পর বিদ্যাপতির বিরহের পদ। এই পর্যায়ে বিদ্যাপতির কবি শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন; কি অপূর্ব সব পদই না পাইয়াছি... কোথাও যেন আনন্দ সাগরে কল্লোল ধ্বনিত হইয়া ওঠে।" কৃষ্ণ চিন্তায় রাধা 'আমিই কৃষ্ণ' এই অদ্বয় উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতি এই তত্ত্বকে অসাধারণ রসে পরিণত করেছেন।

২. চন্ডীদাস

কবি চন্ডীদাস বৈষ্ণব সাহিত্যে বেদনার কবি। বিরহের কবিতা ও বেদনা যত সহজে মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারে অপর কোন অনুভূতি তা পারে না ।চণ্ডীদাসের কাব্য চমক নেই ,অলংকার নেই। অতি সহজ সরল ভাষায় প্রানের ভাষায় তিনি রাধার বিরহ কে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি। চন্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয়, দুঃখের প্রতি অনুরাগ।" চণ্ডীদাসের রচনায় মাথুর আদি অংশবিশেষে যেন বিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে তা নয় ,পূর্বরাগ- আক্ষেপানুরাগ, এমনকি মিলনের মধ্যেও সেই চিরন্তন বিরহের সুর শোনা গেছে।

৩. গোবিন্দদাস

প্রকৃতপক্ষে যে সাধনা বলে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন গোবিন্দদাস, সেভাবে আর কেউ হননি। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব কবি, কিন্তু রাধাভাব তার সাধনা নয়। তাই রাধার বেদনা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়ত পারেননি, তা সত্বেও গোবিন্দদাস মাথুরের পদ রচনায় তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনই একটি পদ -

নামহই অক্রুর ক্রুর নাহি সে সম

সো আওল ব্রজমাঝে,

ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবন অমঙ্গল

কালি কালিহুঁ সাজ।। ...

কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন অক্রুর এসেছেন ব্রজপুরীর ঘরে ঘরেই দুঃসংবাদ পৌঁছে গেছে। তখন গোবিন্দদাসের রাধা স্বগোতক্তি করেন -

সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছ নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী।।

যার জন্য এমন দুস্তর সাধনায় তিনি দিন পাত করেছেন, তিনি চলে যাবেন অথবা হয়তো যাবেন না। তারপর যখন প্রকৃতই কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছেড়ে চলে গেলেন তখন রাধার বুকফাটা আর্তনাদ ঘোষিত হয় -

পিয়া গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপদে পড়লে যৈছে মালতীমালা।।

কৃষ্ণ বিহীন জীবনে তার কোন সাধ নেই। অতএব সাধনই তিনি তার সত্য বুঝে নিয়েছেন রাধা। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিরহের অবসান। অন্তরের ধন প্রাপ্তি ঘটতে পারে মৃত্যু দিয়েই। বিরহ এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল রাধা তার মনকে। এবার তার পরিসমাপ্তি মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ।এই মুহূর্তে তিনি কামনা করেন তাঁর মৃত্যুর পর দেহাবশেষ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে। এবং সেটি যেন মাটিতে পরিণত হয় যার ওপর দিয়ে কৃষ্ণ একসময় পদচারণা করবেন।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।।

গোবিন্দদাস হয়তো বিরহে বিশ্বাস করতেন না বলে মথুরাতে তিনি রাধাকৃষ্ণের মানস মিলন ঘটিয়েছেন।

৭.২) আত্মনিবেদন

প্রার্থনার পদে আত্মনিবেদন করেছেন স্বয়ং কবি বিদ্যাপতি । এতে কবির কাতর স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নিবেদনের পদগুলিতে আত্ম নিবেদন করেছেন

স্বয়ং শ্রীমতি রাধা। অন্তরালে থেকে গেছেন কবি। এই জন্যেই পদগুলি পৃথক শিরোনামে চিহ্নিত করা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মতে 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান' বলে কোন বৈষ্ণব এইভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না ।তাই কৃষ্ণপদে তাদের আশ্রয় হলেও শ্রীরাধিকার বেনামীতে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে হয়। রাধা কৃষ্ণ লীলা তাদের অংশগ্রহণের কোন অধিকার নেই।প্রার্থনার পদে উপাস্য- উপাসক, সেব্য- সেবকের প্রভেদ সুস্পষ্ট। কিন্তু নিবেদনের পদে পরস্পর আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়েই ভেদবুদ্ধির লুপ্ত হয়ে যায়। এই নিবেদন প্রেমের পরাকাষ্ঠা। নিবেদনের পদে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর সখ্য ও আত্মনিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট। চন্ডীদাস ছাড়াও যদুনাথ দাস, নরহরি, গোবিন্দদাস এই পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন।

প্রার্থনার পদ শুধুমাত্র বিদ্যাপতি রচনা করেছেন। অন্য রচনা করল প্রার্থনা সঙ্গে তার একটি পার্থক্য বজায় রয়েছে।এগুলিকে নিবেদন নাম দিলে তার আন্তরিকতার অভাব পাওয়া যায় না, অথবা আত্মসমর্পণের এখানে কোন দ্বিধা নেই। তবুও এগুলো প্রার্থনার নয়।এই দুইয়ের মূল পার্থক্য- প্রার্থনার পদে কবি স্বয়ং ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে। পক্ষান্তরে নিবেদনের কবিরা আত্মনিবেদন করেছে শ্রীমতি রাধিকার জবানীতে। প্রার্থনার কবি অর্থাৎ ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কোন আড়ালই নেই। ভক্ত হৃদয়ের আকুলতা সরাসরি ভগবানের নিকট নিবেদন করছে। কিন্তু নিবেদনের পদগুলিতে রাধার হৃদয় এবং তারই আত্মনিবেদন বর্ণিত হয়েছে ।কবি তার ব্যক্তি হৃদয়ের আবেগকে রাধার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তখনই তারা কৃষ্ণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কবি ও ভক্ত মঞ্জরীভাবের অর্থাৎ সখীভাবের সাধনার অধিকারী। তারা রাধা কৃষ্ণ লীলার দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সেই লীলায় অংশগ্রহণ করতে পারেনা। তারা শুধুমাত্র লীলা সুখ অর্থাৎ লীলা দ্রষ্টার সুরসিক গ্রহীতা।তাই সরাসরি রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো অধিকার তাদের নেই। কিন্তু প্রার্থনা পদের স্রষ্টা বিদ্যাপতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি প্রাকচৈতন্য যুগের কবি

এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সৃষ্টির আগেই তার পদ রচনা হয়ে গিয়েছিল। তাই তার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ ছিল না।

নিবেদনের পদ রচনায় প্রথমেই নাম করতে হয় চন্ডীদাসের। চন্ডীদাসের রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণ সমর্পিত প্রানা। তাই বহু রচনাতেই তার আত্মনিবেদনের ভাবটি সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে আন্তরিকতায় ও ভাবের গাঢ়তায় দুজনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরনে জনমে জনমে
প্রাননাথ হইও তুমি।।

এই পদে রাধা জন্ম-জন্মান্তরে ,প্রতি জন্মে কৃষ্ণকে প্রাননাথ রূপে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। বিদ্যাপতির পদে আবার সেই আকুতি ধ্বনিত হয়েছে-

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
দেহ-মন আদি তঁহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।।
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন।।
পিরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়েছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়।।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে

তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার

গলায় পরিতে সুখ।।

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত

ভাল-মন্দ নাহি জানি।

কহে চন্ডীদাস পাপ পুন্য সম

তহারি চরণখানি।।

পদটিতে অখিলের নাথ কালিয়ার প্রতি রাধার জবানীতে কবি চন্ডীদাসেরই আত্মসমর্পণের কথা শোনা যায়।

অর্থাৎ, বন্ধু তুমি আমার প্রান। দেহ-মন, কুলশীল, জাতি, মান সবই তোমাকে সমর্পণ করেছি। হে কৃষ্ণ অর্থাৎ কালিয়া তুমি অখিলের নাথ, যোগীর আরাধ্য ধন। আমি হীন গোয়ালিনী। ভজন পূজন জানিনা। প্রেমরসে দেহ-মনকে ঢেলে দিয়ে তোমার পায়ে নিজেকে নিবেদন করেছি। তুমি আমার পতি। তুমি আমার গতি। মনে আর অন্য কিছু উদয় হয় না। সমস্ত লোকে আমাকে কলঙ্কী বলে ডাকে। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তোমার জন্যে কলঙ্কের হার গলায় পরেও আমার সুখ। আমি সতী এবং অসতী - তুমি জানো, আমি ভালো-মন্দ কিছুই জানিনা ।এরপরই চন্ডীদাস বলেন পাপ পুণ্য আমার নিকট সমান কারণ তোমার চরণেই আমার আশ্রয়।

এ আত্মনিবেদনে আয়ানের বিবাহিত পত্নী রাধা কৃষ্ণের প্রেমে মত্ত। জাগতিক নিয়মে এতে রাধার সতীত্ব বিঘ্নিত হয়। কিন্তু পর পুরুষ কৃষ্ণের আসল রূপ পরমপুরুষ। তাই জাগতিক নিয়ম এখানে থাকেনা। তাই রাধা অসংকোচে বলেছেন আমি সতী কিংবা অসতী, আমিও জানিনা।জানেন শুধু বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ।

জ্ঞানদাসের আত্ম নিবেদন মূলক অল্প কয়েকটি পদ রয়েছে। পদগুলি রাধার বচনে রয়েছে।এতে আত্মসমর্পণের ভাবটি সুস্পষ্ট না হলেও তিনি যে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে

যেতে চাইছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন একটি পদ-

তোমায় আমায় একই পরান

ভালে সে জানিয়ে আমি।

হিয়ার হইতে বাহির হইয়া

কিরূপে আছিলা তুমি।।

অথবা,

বঁধু ,তোমার গরবে গরবিনী হাম

রূপসী তোমার রূপে ।

হেন মনে লয় ও দুটি চরণ।

সদা লয়্যা রাখি বুকে।।

লোচনদাস প্রার্থনায় যেমন চৈতন্যদেবের প্রতি নিবেদন রয়েছে ,তেমনি অপর কোন পদে তিনি হরি কৃপা কামনা করেছেন-

লোচন বো মো অধমে দয়া নৈল কেনে।

তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে।।

নরোত্তম দাস অনেকগুলো প্রার্থনার পর লিখেছেন। তার আকুতিতে গৌর নিতাই বন্দনা এবং অনেকগুলি পদে জীবনের বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।

কবে বৃষভানুপুরে আহীর গোপের ঘরে

তনয়া হইয়া জনমিব।।

এছাড়া বলরাম দাস রাধা কৃষ্ণের আত্মনিবেদনের পদ রচনা করেছেন।কিছু ক্ষেত্রে নিজের হৃদয়ের আকুতিও তিনি প্রকাশ করেছেন।

৭.৩) ভাবসম্মিলন

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সম্ভোগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় চতুর্বিধ সম্ভোগের মধ্যে 'সমৃদ্ধিমান' সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ । প্রবাসের পর যখন নায়ক নায়িকার মিলন হয় তাকেই

বলে 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ'।কিন্তু বাস্তবে নায়ক কৃষ্ণ মথুরা প্রবাসের পর আর কখনো বৃন্দাবনে ফিরে আসেনি বলেই রাধার সঙ্গে তার মিলন সম্ভব না হওয়াতে 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের' বাস্তবে রূপ লাভ করা সম্ভবপর হয়নি। তবে বাস্তব জগতে যা সম্ভবপর নয়, ভাবজগতের তাকে সম্ভব করে তোলা যায়। বৈষ্ণব আচার্য এই সুযোগ গ্রহণ করে সম্ভোগ তথা স্বপ্ন সম্ভোগের অবতারণা করেন এবং ভাবজগতের রাধা কৃষ্ণের মিলন সাধনের ব্যবস্থা করেন। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ এই স্বপ্ন-সম্ভোগ বা ভাবসম্মেলন নামে অভিহিত করেছেন।

'উজ্জ্বলনীলমণি' তে 'ভাবোল্লাস' বা 'ভাবসম্মেলন'এর কোন উল্লেখ না থাকলেও 'পদকল্পতরু'তে চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে যেসব পদ সংকলন করা হয়েছে তাদের ভাবোল্লাসের পদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।সখীদের প্রতি শ্রীমতি রাধার যে স্নেহ ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ভাবোল্লাস " বিরহবিকারের আবেশে রাধাকল্পনা মাধ্যমে কৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভগ কছেন-একেই ভাব সম্মেলন বলা হয়"। বিরহ সইতে না পেরে অভিনব উপায়ে গ্রহণ করে রাধা কৃষ্ণের মিলন সাধন করিয়েছেন পদকর্তারা। রাধা কল্পনা মাধ্যমে কৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছেন, একে ভাবসম্মিলন নাম দিয়ে বৈষ্ণব পদকর্তা পদ রচনা করেছেন। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন" ভাব সম্মিলনের পদগুলির আবেগ নিষ্ঠা ও রসের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।" কারণ এই পদসমূহে বিরহ ও মিলন একসাথে মিলিত হয়। এরপর রাধা কৃষ্ণের মিলন হয়নি বটে, "কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ এই বিরহের হাহাকারে কেমন করিয়া সমাপ্তি রাখা টানিবেন? তাই তারা ভাবসম্মিলন ও ভাবোল্লাস নামক এক পৃথক পর্যায় পরিকল্পনা করিয়াছেন।...তাই এই পর্যায়ের পদে রাধাকৃষ্ণের কাল্পনিক মিলনের চিত্র আখিয়া তাহারা বিকাশের উপসংহার করিয়াছেন।"

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পৃথক নামে অভিহিত হলেও ভাবোল্লাস এবং ভাবসম্মিলন একই বস্তু। এখানে বৈষ্ণব পদকর্তা বৈষ্ণব রসশাস্ত্র নির্দেশ না মেনে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন

করেছেন। আমরা সম্ভোগকেও এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি, কারণ প্রবাসের পর বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রকৃত সম্ভগের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবে সম্ভব নয়। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, সম্ভোগ নায়ক নায়িকার মিলন কাব্য বৈষ্ণব শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নায়িকার প্রেম এখানে পরকীয়া বলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে বৃন্দাবনে 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ' কল্পনা করা কঠিন।

এই ভাবসম্মেলনের একটি তাত্ত্বিক অর্থ আছে । কবিশেখর কালিদাস রায়ের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধা কৃষ্ণের নিত্য মিলনের কথা বলেছেন তা বৃন্দাবনের রূপলোকে নয় বা কোন কঞ্জে নয়, তা সম্পূর্ণভাবে ভাবলোকে। মহা ভাবই বৃন্দাবনলীলায় রূপের মাঝে অঙ্গ লাভ করেছে ।সেরূপ আবার ভাব এর মাঝে ছাড়া পেয়েছে। এটি ভাবসম্মেলনের মূল কথা । বলরাম দাস বলেছেন" হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"- রাধার হিয়ার ভিতর থেকে শ্যামকে বের করেছিলেন বৈষ্ণব কবিরাই। এতেই তৈরি হয়েছিল বৃন্দাবন লীলা। সমগ্র লীলাবিলাস ভেতর হতে বহিস্কৃত হৃদয়ের ধন কেটে পড়ার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয় । এই হিয়ার ধন হিয়ায় ফিরে যাওয়ার নাম ভাবসম্মেলন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মথুরা গমনের পর কৃষ্ণ আর কোনদিন বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি। এই বিরহ বিকারের আবেশে রাধা কল্পনা মাধ্যমে ভাব যোগে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করছেন। এটাই হল ভাবসম্মিলন অর্থাৎ ভাবের জগতে মিলন। ভাবের জগতে মিলন জনিত যে উল্লাস, তাকেই বলে ভাবোল্লাস। বিদ্যাপতির

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ" বা

"কি করিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দির মোর"

প্রভৃতি পদগুলি ভাবসম্মিলন এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। চন্ডীদাসের

"সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।

মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব,

কপাল কহিয়া গেল

এই পদগুলি এই পর্যায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চন্ডীদাসের ভাবোল্লাসের একটি পদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে

বহুদিন পর বঁধুয়া এলে।

দেখা না হইত পরান গেলে।।

এতেক সহিনু অবলা বলে।

ফাটিয়া যাইত পাষান হলে ।।

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।

মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।।

এসব দুখ কিছু না গণি।

তোমার কুশলে কুশল মানি।।

সব দুখ আজি গেল হে দূরে ।

হারান রতন পাইলাম কোরে।।

কোকিল আসিয়া করুক গান।

ভ্রমরা ধরুক তাহার তান।

মলয় পবন বহুক মন্দ।

গগনে উদয় হউক চন্দ।।

বাশুলী আদেশে কহে চন্ডিদাসে।

দুখ দূরে গেল সুখ বিল।।

অর্থাৎ বহুদিন পরে বধুয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ এসে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিল ।অবলা বলে এতক্ষণ সহ্য করা গিয়েছিল। পাষান হলে বহুদিন আগেই তা ফেটে যেত। দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। মথুরা নগরীতে কৃষ্ণ তো ভালোই ছিল ।আমি আমার এসব দুঃখকে গণনা

করিনা। তোমার কুশলী আমি নিজের কুশল বলে মনে করি ।আজ সব দুঃখ দূর হয়ে গেল, হারানো রত্ন যখন ফিরে পেলাম। কোকিল এখন গান করুক, ভ্রমর তার তান ধরুক। মলয় পবন মৃদু মন্দ বইতে থাকুক। গগনের চাঁদ উঠেছে। চন্ডীদাস বললেন এবার রাধার বোধহয় সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেল। এখানে শ্রী কৃষ্ণের মথুরা থেকে প্রত্যাবর্তন ও বিরহ অন্তে রাধার সঙ্গে তার মিলনের চিত্রটি রাধার ভাবাবেশের মুহূর্তে কল্পনা করা হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ রাধার জীবনের ভালো-মন্দ যে কিরকম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছে সেটি পদটির মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে কোন উচ্ছ্বাস নেই ,শুধু একটুখানি আক্ষেপ দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস রয়েছে, দুঃখ এবং দুঃখের সান্তনা রয়েছে।

ক) ভাবোল্লাস এর কবিগণ

১. বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির রাধিকার বিচিত্র অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে এসেছে তার বিরহ বেদনা এবং ভাব সম্মেলনের পদে। যেন তিনি নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর কাব্যে ভাব সমাবেশের জন্য মহাপ্রভু অকৃপনভাবে তার ভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশেষত ভাবসম্মেলন বা ভবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতি তুলনা রোহিত।বিদ্যাপতির রাধা মথুরায় দুতি পাঠিয়েছেন, কৃষ্ণকে নিয়ে আসবেন ভেবে। এভাবেই তার আনন্দ -

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।।

দেহকে আরাধ্যদেবতার অধিষ্ঠান ভূমিরূপের কল্পনা করার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্বিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। The human body is the highest temple of God. এখানেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের আভাস দেয়া হয়েছে এর মাধ্যমে পরম প্রিয়াকে শ্রীমতি বলছে-

আজু রজনী হাম ভোগে পোহায়লুঁ
পেঁখলু পিয়া মুখ চন্দা ।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ

দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।

রাধার উল্লাসে সমগ্র পৃথিবী যেন তার আনন্দ ধ্বনি শুনতে পায়। যে কোকিলের কুহু বিরহিনী রাধা কানে অগ্নি বর্ষণ করত ,চাঁদের আলোয় তার বুক ভেঙে যেত, আজ তাদের প্রতিও তিনি কৃপা দেখিয়েছেন

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ

লাখ উদয় করু চন্দা।

২. চন্ডীদাস

আক্ষেপানুরাগের পদে চন্ডীদাস দ্বিতীয়, কিন্তু ভাবসম্মেলনের পদগুলোতে যেন তার আন্তরিকতা আরো বেশি। জীবনভোর রাধা কৃষ্ণের সন্ধানেই কাটিয়েছেন, কৃষ্ণ তার জীবনের জ্বালা শুধু বাড়িয়েছে তা সত্বেও যেন রাধিকা বলছেন

'জীবনে মরনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি'

আর তখন বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকেনা।রাধা প্রেম যে কামনা বাসনা আশ্রিত মর্ত্য প্রেম থেকে বহু ওপরে আধ্যাত্মলোকে বিরাজ করে।রাধা ভাবলোকে মথুরা থেকে কৃষ্ণের আসার কথা উপলব্ধি করেছেন।

আইস বন্ধু আইস আধ আঁচরে বৈস

নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি

৩. জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাসও ভাবসম্মেলনে কয়টি পদ রচনা করেছেন ।এখানে মিলন মুহূর্তে রাধার উল্লাস এর মধ্যে বেদনার উক্তি ধরা পড়েছে।

অচিরে পুরব আশ। বঁধুয়া মিলব পাশ।।

কিছু গদগদ স্বরে। এ দুঃখ কহিব কাহারে।।

জ্ঞানদাসের রাধা মনেপ্রাণে অনুভব করেন যে রাধা ও কৃষ্ণের একই পরান তাই আকুল

আগ্রহে তিনি প্রিয়তমকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিয়ে থাকেন।

বঁধু আর কি ছাড়িয়ে দিব।

এ বুক চিরিয়া সেখানে পরাণ

সেখানে তোমারে থোব।

৭.৪) প্রার্থনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রসশাস্ত্র অনুযায়ী পঞ্চরসের তত্ত্ব স্বীকার করলেও বাস্তবে দাস্যভাবের প্রতি অনেকেরই অনীহা দেখা যায়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রার্থনাসূচক কোন পর্যায় বৈষ্ণব পদাবলীর রাসলীলাতেও প্রার্থনার কোন স্থান নেই। কিন্তু তা সত্বেও কোন কোন পদকর্তা প্রার্থনাসূচক কিছু পদ রচনা করেছেন। দাস্যভাবে ভগবানকে প্রভু উপাসনা করা হয়, তাই এই ভাবে উপাসনায় ভগবানের ঐশ্বর্য রূপই প্রকাশ পায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধক বলে তারা ভগবানের ঐশ্বর্য ভাবকে কখনো কামনা করেন না। সেই কারণে চৈতন্য উত্তর যুগে কোন কবি প্রার্থনার পদ রচনা করেন নি। চৈতন্য পূর্ব যুগে বড়ুচন্ডীদাস রচিত কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপে প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতির কয়েকটি প্রার্থনাসূচক কবিতায় ভগবদ ভক্তি এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে পার্থিব কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়ে ভক্ত একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন, মুক্তির কামনা প্রকাশ করেন। ভক্ত ভগবানের মধ্যে এইরূপ অবস্থার মধ্যেই শান্তরস সৃষ্টি হয়। তখন ভক্ত কবি অসার অনিত্য সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানায়। একেই প্রার্থনার পদ বলে। প্রার্থনার পদে ভগবানের ঐশ্বর্যশালী রূপ প্রধান এবং এই পদগুলো শান্তরসাশ্রিত। জগৎ সংসারের সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক অস্বীকার করে নিত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেন এবং মায়াময় সংসার থেকে তখন তিনি মুক্তি চান। প্রার্থনার পদগুলোতে ভক্তেরই আত্মসমর্পণ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

প্রার্থনার পদে কৃষ্ণলীলা না থাকলেও ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা রয়েছে এবং কৃষ্ণের সামনে রাধার আত্মনিবেদনের ভাবটি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। রাধা কৃষ্ণ লীলা

থেকে আত্মনিবেদনের শিক্ষা লাভ করেন ভক্ত কবি। সম্ভবত প্রার্থনার পদে তাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে নিজের জীবনকে ধন্য এবং সার্থক করে তোলার প্রেরণাতেই কোন কোন কবি এই জাতীয় পদ রচনা করেছেন।

প্রার্থনা মূলক কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বিদ্যাপতি। এই পর্যায়ে তার কবিতা গুলির মধ্যে গভীর আত্মনিবেদন, আত্ম দৈন্য ,ঈশ্বর ভক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে কবির সাধক রূপ। বিদ্যাপতি রচিত সম্ভোগ ও মিলনের পদগুলি প্রথাসিদ্ধ অলংকারের প্রয়োগের সমৃদ্ধ কিন্তু প্রার্থনায় সহজ-সরল ভাষায় পরমেশ্বর এর কাছে তিনি আত্ম নিবেদন করেছেন। পরম ব্রহ্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যে দার্শনিকতার স্পর্শ এসেছে তা বিদ্যাপতির পান্ডিত্যের পরিচয় দেয়।বিদ্যাপতি প্রথাগতভাবে বৈষ্ণব ছিলেন না, ঈশ্বরকে ঐশ্বর্যময় মনে না করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মতানুসারে লীলাময় মনে করে তিনি পদ রচনা করেননি। তার প্রার্থনার পদগুলো একান্ত আত্মনিবেদনের সুরে অনুরণিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐশ্বর্য আগ্রহী যেমন তিনি নন, তেমনি মুক্তি কামনা বা মোক্ষও তার সাধনার বিষয় নয়। কারণ সাধন ভক্তিতে কৃষ্ণ সেবার ব্যতীত অন্য কোন বাসনা না থাকলে শুদ্ধ ভক্তির সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

বিদ্যাপতির ভাবসম্মেলনের পদগুলি আলোচনা কালে যেমন তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে সন্দেহ থাকে না,তেমন তার প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিভিন্ন পদকর্তারা কৃষ্ণকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন, প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির দৃষ্টি তা থেকে শুধু স্বতন্ত্র নয়, অনেকটা অভিনব। বৈষ্ণব কবিতায় ভণিতা ছাড়া কোথাও কবিরা নিজের কথা বলেননি। যা বলেছেন তা সবই রাধাকৃষ্ণ বা সখা - সখীর জবানী। প্রার্থনার আকুলতা রাধার ওপর আরোপ করা যেতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। কারণ এগুলো একান্তভাবেই বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন ।এজন্য নিজের ভাষায় অন্তরের অসহায়তার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন আত্মসমর্পণ প্রার্থনার পদগুলিতে। বিদ্যাপতির

একটি বিশিষ্ট প্রার্থনা বিষয়ক পদ-

যতনে যতেক ধন পাপে বটারলুঁ

মেলি পরিজনে খায়।

মরণক বেরি হেরি কোঈ ন পুছত

করম সঙ্গে চলি যায়।।

প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি অভিনব কবি ভাবনায় বলেছে নিজের বিশ্বাসের কথা।যেখানে কবির ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থার ছায়াপাত ঘটেছে ।এই গভীর আন্তরিকতা এবং তীব্র আকুতি সুরে পদগুলি রচিত তা বোঝা যায়।

বিদ্যাপতির একটি পদ

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।

দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ

দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।

এই প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি শুধু আত্মসমর্পণ করেননি, যদি কর্মবিপাকে কীটপতঙ্গ আদির রূপে তাকে জন্ম গ্রহণ করতে হয়, তবু যেন 'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ'। তাই তিনি স্বাস্থ্য বিধানের 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু' বলেছেন ।গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'মামেকং শরণং ব্রজ' - বিদ্যাপতি যেন সেই আহবানে সাড়া দিয়ে এখানে সেই শরণ নিয়েছেন। এই কৃষ্ণ ব্রজদুলাল কৃষ্ণ নন। বিদ্যাপতির এই আত্মসমর্পণ যেন অধিকারভিত্তিক নয় ,তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে গুণের বিচার করতে গেলে তার মধ্যে লেশমাত্র পাওয়া যাবে না। তবে তিনি কিসের অধিকারে 'উদ্বাহুরিব বামন'। ভগবান জগৎপতি আর বিদ্যাপতির যত তুচ্ছ হন না কেন, তিনি জগতের বাইরে নন। অতএব ভগবান বিদ্যাপতিকে কৃপা দান করতে বাধ্য।

বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের অপর একটি বিখ্যাত পদ -

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম

সুত মিত রমণী সমাজে।

তোহে বিসরি-মন তাহে সমর্পিলু

অব মুঝ হব কোন কাজে।।

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।

তুহুঁ জগ- তারণ, দীন দয়াময়,

অতয়ে তহারি বিশয়াসা।

আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লু,

জরা শিশু কতদিন গেলা ।

নিধুবনে রমণী রসরঙ্গ মাতলুঁ,

তহে ভজবো কোন বেলা।।

এখানে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়নি এটি একান্তভাবেই বিদ্যাপতি নিজস্ব বক্তব্য ।নিজের মুক্তি কামনার জন্য তিনি ভগবানের চরণে স্মরণ নিয়েছেন। কাজেই প্রকৃত বিচারে এটিকে বৈষ্ণব পদ বলে গ্রহণ করা সংগত নয় । উত্তপ্ত সৈকতে বারি বিন্দুর মতো স্ত্রী-পুত্র দ্বারা গঠিত সমাজ আমাকে প্রতিমুহূর্তে শোষণ করে নিচ্ছে। তোমাকে বিস্মৃত হয়ে তাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। এখন আমি আর কোন কাজে লাগবে? অর্থাৎ আমার এখন উপায় কী হবে। মাধব আমার এই পরিনাম নৈরাশ্যের।তুমি দয়াময়,আমি তাই তোমার উপরে বিশ্বাস রাখছি। অর্ধেক জীবন আমি নিদ্রায় কাটিয়েছি।কত দিন গেল, শৈশবে বার্ধক্যে কত কাল কাটালাম, নিধুবনে রমণীদের সঙ্গে রসরঙ্গ করে তোমাকে আর আমি রচনা করার সময় কোথায় পেলাম। কত ব্রহ্মার উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটেছে কিন্তু তোমার আদি বা অন্ত কিছুই নেই। সাগরের বুকে যেমন ঢেউ ওঠে এবং সাগরের বুকে মিলিয়ে যায়, তেমনি ব্রহ্ম তোমার থেকেই সৃষ্টি হয়, আবার তোমাতে বিলীন হয়। বিদ্যাপতি বলেন, শেষ সময় কালে তুমি বিনা আমার আর কোন গতি নেই। তোমাকে অনাথের নাথ বলা হয়। এখন আমার পরিত্রাণের ভার তোমারি ওপর।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলি নিবেদনের উদ্বোধন ঘটায়। বিদ্যাপতির রচনা সর্বোচ্চ ঐশ্বর্যের প্রকাশ এই শ্রেণীর পদগুলি। এই আত্মনিবেদন একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলী সঙ্গে তুলনীয় ।

প্রার্থনা পদে আত্মনিবেদন করেছেন স্বয়ং কবি বিদ্যাপতি। শুধু কাতরোক্তিই এখানে ধ্বনিত হয়েছে কিন্তু নিবেদনের পদগুলিতে আত্মনিবেদন করেছে স্বয়ং শ্রীমতি রাধিকা। কবি এখানে অন্তরালেই থেকে গেছেন। এইজন্যেই পদগুলি আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মতে মোক্ষ প্রধান বলে কোন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব একইভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার আশ্রয় হল শ্রীরাধিকার বেনামীতে তাদের এই মনোভাব প্রকাশ করতে হয়। রাধা কৃষ্ণের লীলা তাদের অংশগ্রহণের কোন অধিকার নেই। শুকপাখি যেমন দূর থেকে উপভোগ করেন বৈষ্ণব ভক্তদের তেমনই দূর থেকে এই রস পান করতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রার্থনা পদে উপাস্য ও উপাসকের,সেব্য ও সেবকের ভেদ সুস্পষ্ট। কিন্তু নিবেদনের পদে পরস্পরের আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে এই ভেদ অনেকটা মুছে গেছে। তাই নিবেদন প্রেমের পরাকাষ্ঠা। নিবেদনের পদে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর আত্মনিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট। চন্ডীদাস প্রার্থনার পদ লেখেনি। কিন্তু তার কয়েকটি পদকে প্রার্থনার নিবেদন পর্যায়ের স্থান দেওয়া যায় ।প্রার্থনার পদগুলিতে কবিরা আত্মনিবেদন করেছেন। কিন্তু নিবেদন পর্যায়ে কবিদের আত্মনিবেদন হয়েছে শ্রীমতি রাধিকার মধ্য দিয়ে। এভাবেই চন্ডীদাসের একটি বিশেষ পদ –

বধুঁ কি আর বলিব আমি ।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।

পদটিতে রাধা জন্ম-জন্মান্তরে ,প্রতি জন্মে কৃষ্ণকে প্রাণনাথ রূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানদাসের কিছু আত্মনিবেদনের পদকে প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন -

বঁধু ,তোমার গরবে গরবিনী আমি

রূপসী তমার রূপে।

হেন মনে লয় ও দুটি চরণ

সদা লয়্যা রাখি বুকে।।

৭.৫) অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যে মাথুর পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এই পর্যায়ে অন্তর্গত পদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২. মাথুর কাকে বলে ?বৈষ্ণব পদাবলীতে মাথুর পর্যায়ের তত্ত্বগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পদ বিশ্লেষণ এর দ্বারা তার সার্থকতা বিচার করো।

প্রশ্ন ৩. মাথুর পর্যায়কে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে আর কি নাম দেওয়া হয়েছে? এই শ্রেণীর বিভাগ গুলি আলোচনা করে শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কৃতিত্ব উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ৪. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আত্মনিবেদনের সার্থকতা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৫. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভাবোল্লাস পর্যায়ের পদগুলির কাব্যগুণ বিশ্লেষণ করো।এই প্রসঙ্গে ভাবোল্লাস পর্যায়টি পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৬. বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাবসম্মেলনের পদগুলির তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৭. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রার্থনা ও নিবেদন বিষয়ক পদগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো । এ সম্পর্কে বিদ্যাপতির প্রতিভা নির্ণয় করো।

৭.৬) গ্রন্থপঞ্জি

১. বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

২ বৈষ্ণব সাহিত্য সমীক্ষা, শ্রীমন্ত কুমার জানা

৩ বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্তব্য

৪ বৈষ্ণব পদাবলী, সত্য গিরি